দ্বাদশ অধ্যায়
মানবসম্পদ উন্নয়ন

[মানব সম্পদ হলো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল চালিকা শক্তি। বিশ্বায়নের যুগে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উৎকর্ষ সাধনে মানবসম্পদ উন্নয়নের ভূমিকা অনস্বীকার্য। জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (এমডিজি) মানব কল্যাণ এবং দারিদ্র বিমোচনকে বৈশ্বিক উন্নয়ন এজেন্ডার মূল কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান দেয়া হয়েছে। এ এজেন্ডা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে। এ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সরকার বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নে মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এলক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার আর্থ সামাজিক খাতে শতকরা ২০ ভাগের অধিক হারে অর্থ মানব সম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত খাতসমূহ যেমন-শিক্ষা ও প্রযুক্তি; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ; নারী ও শিশু; সমাজ কল্যাণ; যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন; সংস্কৃতি এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যয় করছে। সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার প্রতিপালনে ২০১৫ সালের মধ্যে "সকলের জন্য শিক্ষা'' নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার একটি নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তাছাড়া, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরি ও উচ্চ শিক্ষার সকল স্তরে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি ও শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্য মানব সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়নসহ বহুবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতকরা ৬০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বিধি প্রবর্তনের ফলে মহিলা শিক্ষকের হার ১৯৯১ সালের ২১ শতাংশ থেকে বর্তমানে ৫৮.৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনের লক্ষ্যে সরকার যুগান্তরকারী কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করেছে উপবৃত্তি প্রকল্প, তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩), রিচিং আউট -অব স্কুল চিলড্রেন প্রকল্প, দারিদ্র্য পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি, শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) এবং মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-২ সহ আরও বেশ কিছু প্রকল্প। উল্লেখ্য শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে জেন্ডার বৈষম্য বিলোপ করে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে সংখ্যাসাম্য অর্জনে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশই সক্ষম হয়েছে। এ ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে শ্রীলংকার পরেই বাংলাদেশের স্থান। সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকে সরকার স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করায় দেশের স্বাস্থ্যখাতেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। প্রজনন হার ও মৃত্যু হার কমেছে। গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাত শিশু ও মাতৃ-মৃত্যুর হার হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবায় অর্জিত সাফল্য অব্যাহত রেখে এ খাতের আরও উন্নয়নের জন্য ২০১১-১৬ মেয়াদে সমন্বিত স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি উন্নয়ন সেক্টর (HPNSDP) কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তাছাড়া নারীদের শিক্ষিত ও দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা ও জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ অনুমোদিত হয়েছে। নারী উন্নয়ন নীতিমালা গ্রহণের পাশাপাশি শিশু স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা এবং শিশু কল্যাণের লক্ষ্যে জাতীয় শিশু নীতিমালা, ২০১১ গৃহিত হয়েছে।]

দেশের জনগণের জীবনমান উন্নয়নে, দারিদ্র বিমোচনে এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী প্রশিক্ষিত ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এবং বিশ্বায়নের পটভূমিকায় মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব নতুন মাত্রা লাভ করেছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে সরকার মানব সম্পদ উন্নয়নে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন এজেন্ডার মূল অঙ্গীকার হচ্ছে মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে মানব কল্যাণ সাধন করা।

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক খাতে বরাদ্দ

সামাজিক খাত দেশের জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থাৎ উৎপাদন, আয় এবং কর্মসংস্থানে অধিকতর মূল্য সংযোজনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এক্ষেত্রে সরকার দেশের দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীর সামাজিক অবস্থার উন্নয়নকল্পে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির পরিধি আরো বিস্তৃত করেছে। ফলে মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য সামাজিক খাতে বিনিয়োগও বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয় বাজেটে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাত প্রাধিকারভুক্ত। তাই সরকার প্রতি বছর বাজেটে এ দু'টি খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রেখে বাস্তবতার নিরিখে প্রকল্প এবং কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। বাংলাদেশ সরকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতকে মানব সম্পদ উন্নয়নের ভিত্তি

হিসেবে বিবেচনা করে। বিগত দশকে (১৯৯১-২০০০) জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনায় ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশু ভর্তির হার ৯৫ শতাংশে উন্নীতকরণ, প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্তির হার ৭০ শতাংশে উন্নীতকরণ এবং বয়স্ক শিক্ষার হার ৬২ শতাংশে উন্নীতকরণ। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ শুধুমাত্র লক্ষ্যমাত্রাই অর্জন করেনি, কোন কোন ক্ষেত্রে এ অর্জন লক্ষ্যমাত্রাকে অতিক্রম করেছে। উল্লেখ্য, ছেলে ও মেয়ে শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রেও ইতোমধ্যে সমতা অর্জিত হয়েছে। তাছাড়া, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সূচকের উন্নয়নে ফলে প্রজনন হার হ্রাস, শিশু ও মাতৃ মৃত্যুহার হ্রাস, যক্ষ্মা ও AIDS রোগের বিস্তার রোধ, গড় আয়ু বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে যা মানব সম্পদ উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

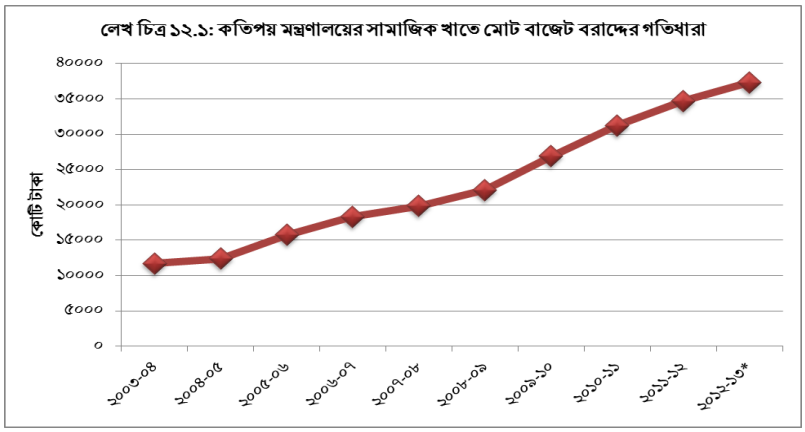

২০০৩-০৪ অর্থবছর থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত সামাজিক খাতে উন্নয়ন এবং অনুন্নয়ন বাজেট-এর সমন্বিত বরাদ্দ ও বরাদ্দের গতিধারা যথাক্রমে লেখচিত্র ১২.১ ও সারণি ১২.১ এ দেখানো হলো। লক্ষ্যণীয় যে, এ খাতে গত এক দশকে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট মিলিয়ে মোট বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলেছে।

তথ্যসমূহ মূল বাজেটভিত্তিক

সারণি ১২.১: কতিপয় মন্ত্রণালয়ের সামাজিক খাতে বাজেট বরাদ্দের (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) বিবরণ

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩*
শিক্ষা এবং বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৭০৬৩	৭৩৮১	৯৩৭৩	১১০৫৭	১১৬৫৪	১২৫৩৫	১৬১৭১	১৮৫৭৫	২০৩১৬	২২১৪৫
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	৩৪৪৫	৩১৭৫	৪১১২	৪৯৫৭	৫২৬১	৬১৯৬	৬৮৩৩	৭৬১৭	৮৮৬৯	৯৩৩৩
যুব ও ক্রীড়া এবং সংস্কৃতি	২৫৭	২৯৭	৪১৪	৩৩৫	২৮৭	৩২০	৫৩০	৯১১	৯২৪	৮৭৮
শ্রম ও কর্মসংস্থান	৫৬	৯০	১০৬	৯৬	১১৯	১২০	৬৯	৬৭	৮২	২০১
সমাজ কল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক	৭১৩	১১৫২	১৩৫৩	১৪৬৮	২০২৮	২৩৯৬	২৮১২	৩৪৯৯	৩৯৬৭	৪০৭৫
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক	১৬৩	৩০০	৩৬৭	৪১৬	৪৬৯	৫৫৩	৪৬৫	৫৪৯	৫৬০	৬৭০
মোট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন)	১১৬৯৭	১২৩৯৫	১৫৭২৫	১৮৩২৯	১৯৮১৮	২২১২০	২৬৮৮০	৩১২১৮	৩৪৭১৮	৩৭৩০২

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। * তথ্যসমূহ মূল বাজেটভিত্তিক

মানবসম্পদ উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম। অধিকন্তু ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নও মানব সম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত। দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই নারী, শিশু ও যুবক। মানবসম্পদ উন্নয়নে তাদের সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে এর সাথে সম্পর্কিত খাত সমূহে যথাঃ শিক্ষা ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান, নারীও শিশু, সমাজকল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন, সংস্কৃতি এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।

শিক্ষা ও প্রযুক্তি

দেশের উন্নয়নের কাংখিত লক্ষ্য অর্জনে সঠিক শিক্ষা কাঠামো এবং যথাযথ শিক্ষা পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে থাকে। এলক্ষ্যে শিক্ষাখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। রূপকল্প ২০২১ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার যুগোপযোগী ও কর্মমূখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের পদক্ষেপ হিসেবে ২০০৯-১০ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর মেয়াদে "জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০" ইতোমধ্যে অনুমোদন করেছে। "জাতীয় শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য

হলো মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়নে ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা।

প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা

সরকার ২০১৫ সালের মধ্যে দেশে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে আন্তর্জাতিকভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ। সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে যে সকল কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তন্মধ্যে দারিদ্র বিমোচন কৌশলে বিদ্যালয়ে ভর্তি, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, উপবৃত্তি ও ছাত্র-শিক্ষক সংযোগ ঘন্টা বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, উপবৃত্তি প্রকল্প, তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩), রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রকল্প, দারিদ্র পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি, শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) এবং মানব উন্নয়নের জন্য স্বাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-২ সহ আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্তমান অর্থ বছরে (২০১২-১৩) প্রাথমিক শিক্ষা খাতে মোট সংশোধিত বরাদ্দের পরিমাণ ৯৪৫৭.২৪ কোটি টাকা।

১৯৯১ সালে বাংলাদেশে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪৯,৫৩৯টি। এ সংখ্যা বেড়ে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ৮৯,৭১২টি (ব্র্যাক সেন্টার, রস্ক সেন্টার, শিশু কল্যাণ ও মাদ্রাসাসহ)। প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা ও হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯১ সালে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির অনুপাত ছিল ৫৫:৪৫। বর্তমানে তা প্রায় ৪৯.৬ : ৫০.৪-এ উন্নীত হয়েছে। নিম্নে ১৯৯৬-২০১১ সাল পর্যন্ত সময়ে প্রাথমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার সারণীতে দেখানো হলোঃ

সারণিঃ ১২.২ প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির শতকরা হার (১৯৯৬-২০১১)

(লক্ষ)

বছর	মোট	ছাত্র (%)	ছাত্রী (%)
১৯৯৬	১৭৫.৮০	৯২.১৯	৮৩.৬১
		(৫২.৪)	(৪৭.৬)
১৯৯৭	১৮০.৩২	৯৩.৬৫	৮৬.৬৭
		(৫১.৯)	(৪৮.১)
১৯৯৮	১৮৩.৬১	৯৫.৭৭	৮৭.৮৮
১৯৯৯	১৭৬.২২	৯০.৬৫	৮৫.৫৭
		(৫১.৪)	(৪৮.৬)
২০০০	১৭৬.৬৮	৯০.৩৩	৮৬.৬৯
		(৫১.১)	(৪৮.৯)
২০০১	১৭৬.৫৯	৮৯.৯০	৮৬.৬৯
		(৫১.০)	(৪৮.০)
২০০২	১৭৫.৬২	৮৮.৪২	৮৭.২০
		(৫০.৩)	(৪৯.৭)
২০০৩	১৮৪.৩১	৯৩.৫৯	৯০.৭২
		(৫০.৮)	(৪৯.২)
২০০৪	১৭৯.৫৩	৯০.৪৭	৮৯.০৬
		(৫০.৪)	(৪৯.৬)
২০০৫	১৬২.২৫	৮০.৯১	৮১.৩৪
		(৪৯.৮৭)	(৫০.১৩)
২০০৬	১৬৩.৮৬	৮১.২৯	৮২.৫৬
		(৪৯.৬২)	(৫০.৩৮)
২০০৭	১৬৩.১৩	৮০.৩৫	৮২.৭৮
		(৪৯.২৬)	(৫০.৭৪)
২০০৮	১৬৭.৪৯	৮৩.২৫	৮৪.২৪
		(৪৯.৭০)	(৫০.৩০)
২০০৯	১৬৫.৩৯	৮২.৪১	৮২.৯৮
		(৪৯.৮৩)	(৫০.১৭)
২০১০	১৬৯.৫৮	৮৩.৯৫	৮৫.৬৩
		(৪৯.৫০)	(৫০.৫০)
২০১১	১৮৪.৩২	৯১.৩৯	৯২.৯৩
		(৪৯.৬০)	(৫০.৪০)

উৎস: প্রাথমিক ও গনশিক্ষা মন্ত্রণালয়

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে পিইডিপি-৩ বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করার লক্ষ্যে স্কুল লেভেল ইমপ্রুভমেন্ট প্ল্যান (SLIP) ও উপজেলা এডুকেশন প্ল্যান (UPEP) পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৭ এপ্রিল ২০০৫ তারিখে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো গঠন করা হয় এবং ০২ জানুয়ারি ২০০৬ তারিখে সরকার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি অনুমোদন করে। বর্তমানে "উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন'' প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান আছে।
- দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে দেশের ৩৩ লক্ষ নব্য-স্বাক্ষরদের ক্রমান্বয়ে স্থানীয় বাজার চাহিদা ভিত্তিক বিভিন্ন ধরণের আয়- সৃজনী প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।
- ৬টি বিভাগীয় শহরের ১০-১৪ বছর বয়সী ১.৬৬ লক্ষ কর্মজীবী শিশুকে মৌলিক শিক্ষা প্রদানসহ জীবনভিত্তিক ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে।
- ২০০৯ সাল হতে সারা দেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পঞ্চম শ্রেণিতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা এবং ২০১০ সাল হতে এবতেদায়ী মাদ্রাসায় সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। উপবৃত্তি ৪০ শতাংশ হতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে উন্নীতকরণসহ সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৪৮ লক্ষ হতে ৭৮.১৭ লক্ষ উন্নীত করা হয়েছে।
- দারিদ্র্য পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি, নির্বাচিত ১২টি জেলা সদরে পিটিআই স্থাপন এবং বিদ্যালয় বিহীন এলাকায় ১৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। আইডিবি সাহায্যপুষ্ট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মান (৩য় পর্যায়), চর, হাওর-বাওর এলাকায় শিখণকেন্দ্র স্থাপন এবং দেশের সকল উপজেলাসমূহকে মৌলিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- বিদ্যালয় পর্যায়ে ইংরেজি শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে "ইংলিশ ইন একশ্যান'' প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী দেশের ২৬,১৯৩টি রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ এবং কর্মরত শিক্ষকদের চাকরি বিধিমালার আলোকে সরকারিকরণ করা হয়েছে, যা ১ জানুয়ারি ২০১৩ হতে কার্যকর করা হবে।

অবকাঠামো সুবিধাদি

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত মান উন্নয়ন লক্ষ্যে মার্চ '১৩ পর্যন্ত সময়ে অবকাঠমোগত উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় ৫৫৫টি সরকারি এবং ৭৭টি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে, ১০৩৫টি সরকারি ও ১৭২টি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণের কাজ চলছে এবং ২৪৮টি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কক্ষ সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বিদ্যালয় বিহীন এলাকায় ১,৬১৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্বাচন করা হয়েছে। আইডিবি এর সহায়তায় ১৭০টি বিদ্যালয় নির্মাণের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। এ ছাড়া ৩২২১টি গভীর নলকূপ স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে ও ৮০০০টি নলকূপ স্থাপণের কাজ চলমান আছে।

সমাপনী পরীক্ষা / বৃত্তি

২০০৯ সাল থেকে সারাদেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা এবং এবতেদায়ী মাদ্রাসা সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ২০১২ সালের সমাপনী পঞ্চম শ্রেণির পরীক্ষায় অবতীর্ণ মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ২৪.৮১ লক্ষ এবং পাশের হার ৯৭.৩৫%। এবতেদায়ী মাদ্রাসা হতে সমাপনী পরীক্ষায় অবতীর্ণ মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ২.৭৬ লক্ষ এবং পাশের হার ৯১.৪৫%। সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রায় ২২ হাজার পরীক্ষার্থীকে ট্যালেন্টপুল এবং প্রায় ৩৩ হাজার জনকে সাধারণ বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, দেশের শ্রমজীবী মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া অব্যাহত রাখার জন্য শিশু কল্যাণ ট্রাষ্টের মাধ্যমে বিশেষ বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

সংযোগ ঘন্টা বৃদ্ধি

ইতোপূর্বে ১ম ও ২য় শ্রেণির জন্য বাৎসরিক সংযোগ সময় ৫৯৫ ঘন্টা এবং ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণির জন্য ৮৩৩ ঘন্টা ছিল। কিন্তু ইতোমধ্যে প্রায় ৪ হাজার দুই শিফটের বিদ্যালয়কে এক শিফটে রূপান্তরিত করার ফলে এক শিফটের বিদ্যালয়ে ১ম-২য় শ্রেণিতে ৮৯৩ ঘন্টা এবং ৩য়-৫ম শ্রেণির বেলায় ১৪৮৮ ঘন্টা দাঁড়িয়েছে। দুই শিফটের বিদ্যালয়ে ১ম-২য় শ্রেণী এবং ৩য়-৫ম শ্রেণির বেলায় ঐ সংযোগ ঘন্টা যথাক্রমে ৫৯৫ ঘন্টা এবং ৮৩৩ ঘন্টা।

বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ

সরকার প্রতিবছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করছে। বছরের শুরুতেই ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক পৌছে দেয়া হচ্ছে। পূর্বে ৫০ শতাংশ নতুন এবং ৫০ শতাংশ পুরাতন বই ছাত্র-ছাত্রীদের দেয়া হতো । ২০১০ সাল হতে সকল শ্রেণীতে ১০০% বই নতুন প্রদান করা হচ্ছে। ২০১২ সালে ৮ কোটি ০৩ লক্ষ এবং ২০১৩ সালে ১০ কোটি ৭৮ লক্ষ পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে। আগামীতে ১০০% নতুন বই বিতরণ অব্যাহত থাকবে।

শিক্ষক নিয়োগ

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শূন্যপদে ও সৃষ্টপদে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ১৮৫২ জন প্রধান শিক্ষক, ১২,৭০১ জন সহকারী শিক্ষক এবং রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আরও প্রায় ৯,৫০০ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ সম্পন্ন করা হয়েছে। এ ছাড়া, ৩৭,৬৭২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিপরীতে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীর জন্য অতিরিক্ত একজন করে ৩৭,৬৭২টি শিক্ষকের পদ সৃজন করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে প্রথম পর্যায়ে ৫২২টি বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটিতে ৫ জন করে সর্বমোট ২৬১০টি শিক্ষকের নতুন পদ সৃজন করা হয়েছে, যার ২১৭টি বিদ্যালয়ের জন্য ১০৮৫টি পদে শিক্ষকের নিয়োগ কার্যক্রম চলমান আছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উপবৃত্তি

দরিদ্র পরিবারের পিতামাতাগণ তাঁদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে উপার্জনের জন্য বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করেন অথবা পিতামাতার পেশায় সহযোগী হিসাবে নিয়োজিত রাখেন। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে ৩৯০০.২৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাংলাদেশ সরকারের সম্পূর্ণ অর্থায়নে 'প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি' শীর্ষক একটি প্রকল্প ২য় পর্যায় (২০০৮-২০১৩) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দরিদ্র পরিবারের এক সন্তান বিদ্যালয়ে প্রেরণের জন্য মাসিক ১০০.০০ টাকা এবং একাধিক সন্তানের জন্য মাসিক ১২৫ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান চলছে। উপবৃত্তি প্রাপ্তির আওতা ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি করায় সুবিধাভোগী ৭৮.১৭ লক্ষে উন্নীত হয়েছে।

স্কুল বহির্ভূত ও কর্মজীবী শিশুদের জন্য কার্যক্রম

দেশের নির্বাচিত ৯০টি উপজেলায় ৬৮৪.৩২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন' প্রকল্পটি জুন ২০১৩ সমাপ্ত হবে এবং এর ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে আরো বৃহৎ পরিসরে রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (২য় পর্যায়) প্রকল্প শুরু হয়েছে। ১ম থেকে ৩য় শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয় এমন কেন্দ্রে বার্ষিক ২৫,৭০০ টাকা হারে এবং ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হয় এমন কেন্দ্রে বার্ষিক ৩০,৯৫০ টাকা হারে অনুদান দেয়া হচ্ছে । শিশুদেরকে ১ম থেকে ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত মাথাপিছু ৫০ টাকা হারে এবং ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত মাথাপিছু ৬০ টাকা হারে শিক্ষা সহায়তা দেয়া হচ্ছে । এছাড়া ১ম থেকে ৩য় শ্রেণির শিশুরা ইউনিফর্ম এর জন্য বছরে ২০০ টাকা এবং ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির শিশুরা এ বাবদ ২৫০ টাকা হারে আর্থিক সহায়তা পাচ্ছে। শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) গ্রহণ করা হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা

ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ, শিক্ষাকে মানসম্মত, সর্বব্যাপী ও ফলপ্রসু করার লক্ষ্যে ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে ৩ কোটি ৬৮ লক্ষের অধিক শিক্ষার্থীর হাতে প্রায় ২৬ কোটি ১০ লক্ষ বই বিনামূল্যে পৌছে দেয়া হয়েছে।

২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ২৯.৩৬ লক্ষ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ২০১২ সাল থেকে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রায় ৩৩ লক্ষ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদানের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত বৃত্তি গ্রহীতার মধ্যে প্রায় ৭৫ শতাংশ ছাত্রী। এ কারণে ইতোমধ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তির ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা অর্জন সম্ভব হয়েছে। স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের সহায়তা ও বৃত্তি প্রদানের নিমিত্ত প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন ২০১২ জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে। সরকার এ লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ডে ১০০০ কোটি টাকা সীড মানি প্রদান করেছে। সমগ্র দেশের স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন ভবন নির্মিত হচ্ছে এবং বিদ্যমান ভবনসমূহের সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। শহর ও গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে সরকার মফস্বলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়নে গুরুত্ব প্রদান করছে। ঢাকা মহানগরীতে ৬টি কলেজ ও ১১টি স্কুল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে । এ সকল প্রকল্পের আওতায় পাঠক্রম আধুনিকায়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনসহ বিভিন্ন রকমের উন্নয়ন ও সংস্কারধর্মী কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় গৃহীত Secondary Education Quality and Access Enhancement (SEQAEP) প্রকল্পের আওতায় শিক্ষা প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ, বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়ন, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও প্রতিষ্ঠানকে কৃতিভিত্তিক প্রণোদনা (Performance-based incentive) প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। Teaching Quality Improvement (TQI) in Secondary Education প্রকল্পের আওতায় দূরবর্তী ও পশ্চাৎপদ স্কুলসমূহকে তথ্য প্রযুক্তির সাথে পরিচিত করার লক্ষ্যে "আইটি বেইজড মোবাইল ভ্যান" চালু করা হয়েছে। এছাড়া, ৫৬৮ টি বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ কম্পিউটার বিতরণ করা হয়েছে। নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানানো, পরিবেশ সংরক্ষণ, নারীর ক্ষমতায়ন, তথ্য প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্তিসহ যুগোপযোগী ও কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে পাঠক্রম প্রণীত হচ্ছে।

কারিগরি শিক্ষা

দেশের যুবশক্তিকে উৎপাদনশীল ও দক্ষ নাগরিকে পরিণত করার লক্ষ্যে দেশে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার প্রসারের জন্য মাদ্রাসাসহ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভোকেশনাল কোর্স চালুকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অস্বচ্ছল পরিবারের তরুণ-তরুণীদেরকে আত্মকর্মসংস্থান উপযোগী ও দেশে-বিদেশে চাকুরি বাজার চাহিদার সাথে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য যুগোপযোগী ট্রেড কারিগরি শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । দেশে বর্তমানে পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের সংখ্যা ১৯৪ টি। যে সকল জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট নেই এমন ১০টি জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং বরিশাল ও সিলেট বিভাগীয় শহরে ২টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রতি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপনের প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন আছে। বিদেশ গমনেচ্ছু ডাক্তার, নার্স ও বেকারদের জন্য আরবি, ইংরেজি, কোরিয়ান ও মালয় ভাষায় কথা বলার দক্ষতা প্রদানের নিমিত্ত দেশের ছয়টি বিভাগে ১১টি আধুনিক ভাষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। বয়ন শিল্পে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেক্সটাইল টেকনোলজিকে বাংলাদেশ ইউনির্ভাসিটি অব টেক্সটাইল-এ রূপান্তরের জন্য একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। তাছাড়া ৪৬০০০.৭০ লক্ষ টাকা অর্থায়নে (জিওবি-৭৩৬০.৭০ লক্ষ, এডিবি-৩৮৬৪০.০০ লক্ষ) Skills Development Project এর মাধ্যমে মানসম্পন্ন TVET শিক্ষাদানের জন্য প্রতিষ্ঠান সমূহের Capacity বৃদ্ধির (অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, ICT উন্নয়ন ইত্যাদি) কাজ চলমান আছে। দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে 'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা' ২০১১ অনুমোদন করা হয়েছে।

উচ্চশিক্ষা

উচ্চ শিক্ষা প্রসারের জন্য ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস, ঢাকা, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর এবং পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া, পার্বত্য অঞ্চলে শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে রাঙ্গামাটিতে একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। দেশে এ যাবৎ প্রতিষ্ঠিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৪টি (উন্মুক্ত ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ) এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬৯টি। এছাড়া বর্তমান সরকার খুলনায় একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রামে একটি মেরিটাইম

বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশালে একটি মেরিন বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশকে একটি আধুনিক ও ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে গাজীপুর জেলায় একটি ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। অতি সম্প্রতি, সরকার দেশে একটি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় এবং পন্ডিত বিহার বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভৌত অবকাঠামো ও অন্যান্য সুবিধাদি সৃষ্টির জন্য ৫১টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৬৮৬৮.৭৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন Higher Education Quality Enhancement শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সৃজনশীলতায় উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে গবেষণার পরিবেশ সৃজনের জন্য Academic Innovation Fund প্রদান করা হচ্ছে। একইসঙ্গে বাংলাদেশ গবেষণা ও শিক্ষা নেটওয়ার্ক (BDREN) এর মাধ্যমে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিভিন্ন ফ্যাকাল্টির ছাত্র ও শিক্ষকদের সাথে আন্তর্জাতিক একাডেমিক কমিউনিটি এবং তথ্য ভান্ডারের সাথে সংযুক্ত করার ফলপ্রসূ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। উচ্চ শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিকীকরণের জন্য সরকার অচিরেই একটি জাতীয় এক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠনের পরিকল্পনা রয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর সুপারিশের আলোকে মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকীকরণ ও যুগোপোযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কার, সংস্থাপন এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কওমী মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, শিক্ষাদানের বিষয় এবং কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা সনদের সরকারি স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য 'বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশন' গঠন করা হয়েছে। স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের সাথে মাদ্রাসা শিক্ষকদের বেতনের যে বৈষম্য ছিল তার সমতা বিধান হয়েছে। ৩১টি মাদ্রাসায় ৪টি বিষয়ে (আল-কোরআন, হাদিস, আরবি সাহিত্য ও ইসলামের ইতিহাস) অনার্স কোর্স চালু করা হয়েছে। তাছাড়া, কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুমতি ও তত্ত্বাবধানে দেশের ১০০টি মাদ্রাসায় দাখিল স্তরে কারিগরি শিক্ষা কোর্স চালু করা হয়েছে। এ সকল মাদ্রাসায় ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় প্রয়োজনীয় সরঞ্জামসহ কারিগরি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩০ (ত্রিশ) হাজার মাদ্রাসা শিক্ষকদের বাংলা, ইসলাম শিক্ষা, সমাজবিজ্ঞান এবং রসায়নে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ৭৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০০০ মাদ্রাসা ভবন নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (BMTTI) এর অধীনে ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষকদের ১ (এক) বছর মেয়াদি উচ্চতর প্রশিক্ষণ কোর্স চালুর কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে সময়োপযোগী করার প্রয়াসে দেশের প্রতিটি মাদ্রাসায় বিজ্ঞান ও কম্পিউটার বিষয় খোলার প্রক্রিয়া এগিয়ে চলছে। চাহিদার প্রেক্ষিতে মাদ্রাসায় কম্পিউটার কোর্স চালু করা হয়েছে এবং প্রণীত কারিকুলামের মাধ্যমে কম্পিউটার শিক্ষাদান করা হচ্ছে।

শিক্ষায় আইসিটি কার্যক্রম

শিক্ষাক্ষেত্রে আইসিটি কার্যক্রম ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সহজতর করার লক্ষ্যে Electronic Students Information Form(e-SIF) এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে অনলাইন প্রযুক্তি ব্যবহার করে এসএসসি, এইচএসসি, দাখিল, আলিম ও সমমানের পরীক্ষা, শিক্ষক নিয়োগ ও নিবন্ধন পরীক্ষার ফলাফল ওয়েবসাইটে প্রকাশ, এসএমএস এর মাধ্যমে এবং ই-মেইলের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীদের নিকট ৬০ দিনের মধ্যে প্রেরণ করা হচ্ছে। ২০১১ সাল থেকে এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল অনলাইনে প্রকাশ করা হয়েছে। ২০১০ সালের শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার ফলাফল এসএমএস এর মাধ্যমে প্রাপ্তির ব্যবস্থাসহ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। ব্যানবেইস কর্তৃক স্থাপিত online data query এর মাধ্যমে criteria ভিত্তিক শিক্ষা-উপাত্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে। ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষ হতে সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের ভর্তি প্রক্রিয়া অন-লাইনে শুরু করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে দেশের প্রায় ১৩,৭০০টি মাধ্যমিক স্কুল, ৫,২০০টি মাদ্রাসা ও ১,৬০০টি কলেজে একটি করে ল্যাপটপ ও একটি করে মাল্টিমিডিয়া প্রদান এবং ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির ওপর শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে যুগোপযোগী আইসিটি ব্যবহারের লক্ষ্যে ICT in Education Master Plan প্রণয়ন করা হয়েছে।

নারী শিক্ষা উন্নয়ন

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে জেন্ডার বৈষম্য বিলোপ করে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে সংখ্যাসাম্য অর্জনের মূল চাবিকাঠি হলো মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি কর্মসূচি। নারীর ক্ষমতায়ন ও আর্থসামাজিক কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাধ্যমিক থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত ছাত্রী উপবৃত্তি প্রদান, বেতন মওকুফ সুবিধা প্রদান, বই ক্রয়ের জন্য আর্থিক সুবিধা প্রদান ও পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য পরীক্ষার ফি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া, মেধাবী ছাত্রীদেরকে সাধারণ মেধাবৃত্তি এবং বৃত্তিমূলক কারিগরি শিক্ষাবৃত্তির পরিমাণ ও সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

শিক্ষার মানোন্নয়নে সংস্কারমূলক কর্মসূচি

শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে একাধিক প্রকল্পের আওতায় দেশে-বিদেশে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, কৃতিভিত্তিক ধারাবাহিক মূল্যায়ন (Performance based continuous evaluation), নতুন কারিক্যুলাম প্রণয়ন, পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তনসহ নানাবিধ উন্নয়ন ও সংস্কারধর্মী কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে নানা অনিয়ম/অসঙ্গতি দূর করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে শিক্ষা আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ভর্তি বাণিজ্য/কোচিং বাণিজ্য বন্ধ করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে এবং কোমলমতি শিশু-কিশোরদের ভর্তি পরীক্ষার চাপ কমানোর লক্ষ্যে ইতঃপূর্বে ২০১১ সালে প্রবর্তিত ভর্তি কার্যক্রমের আদলে ১ম শ্রেণীতে লটারির মাধ্যমে বর্তমানেও ভর্তি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। লক্ষ্যণীয় যে, সরকার কর্তৃক বিবিধ পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বিদ্যালয়ে ঝরে পড়া কমছে, শিক্ষার গুণগতমান এবং পাবলিক পরীক্ষায় শহর ও গ্রামে পাশের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৩ সালের এসএসসি, দাখিল ও এসএসসি (বৃত্তিমূলক) পরীক্ষায় ২৭,০৭২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে সর্বমোট ১২ লক্ষ ৯৭ হাজার ৩৪ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে- ১১ লক্ষ ৫৪ হাজার ৭৭৮জন উত্তীর্ণ হয়, গড় পাশের হার ৮৯.০৩ শতাংশ।

অর্থ বরাদ্দ

২০১২-১৩ অর্থ বছরের বাজেটে অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার শিক্ষা খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য ধারাবাহিকভাবে অর্থ বরাদ্দ বাড়ানো হচ্ছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরের বাজেটে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুকূলে রাজস্ব খাতে ৯,০৪৫ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন খাতে ২,৫৫৩ কোটি টাকা সর্বমোট ১১,৫৮৩ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এছাড়া ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মচারীদের জানুয়ারি, ২০১৩ হতে চিকিৎসা ভাতা এবং বাড়িভাড়া ভাতা বাড়ানো হয়েছে এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহকারি গ্রন্থাগারিকদের এমপিওভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতনও বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং দেশের তৃণমূল পর্যায় থেকে মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে খুঁজে বের করার জন্য সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ নীতিমালা ২০১২ প্রণয়ন করে এর বিপরীতে ২,৭৮,৩৩,০০০/- টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন আরও অন্যান্য খাতে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে অর্থ বিভাগের অপ্রত্যাশিত ব্যয় ব্যবস্থাপনা খাত হতে মোট ২৪৩,৮১,৮৫,২০০/- টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উন্নয়ন কার্যক্রম

সরকারের সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা হলো সকল নাগরিকের স্বাস্থ্য সুরক্ষা । সরকার বিভিন্ন কর্মসূচির দ্বারা সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নের নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ১৯৬৫ সাল হতে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করার হার সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ের ৭.৩ শতাংশ হতে ৫৮.৪ শতাংশ এ উন্নীত হয়েছে । মহিলা প্রতি মোট প্রজনন হার ১৯৭১-৭৫ এ ৬.৩ হতে ২০১১ এ ২.১১ এ নেমে এসেছে। সম্প্রতি Maternal Mortality and Health Care Survey 2011 এর রিপোর্টে দেখা গেছে, বাংলাদেশে মাতৃ মৃত্যুহার প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ২০০১ সালে ৩.২ শতাংশ থেকে ২০১১ সালে ২.০৯ শতাংশে নেমে এসেছে । ১৯৯১ সালে কম ওজনের প্রায় ৬৬ শতাংশ শিশু জন্ম গ্রহণ করত যা বর্তমানে ৩.৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ২০০৪ সালে দক্ষ ধাত্রী দ্বারা প্রসবের হার ছিল ১৬ শতাংশ যা বর্তমানে ৩২ শতাংশ। উল্লিখিত সাফল্য সত্ত্বেও অধিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধকল্পে এবং পরিবেশ-অনুকূল ও টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে “জাতীয় জনসংখ্যা নীতি”র খসড়া প্রণীত হয়েছে। এছাড়া, ইতোমধ্যে “জাতীয় স্বাস্থ্য

নীতি”ও প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারের সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ইতোমধ্যে প্রজনন হার ও মৃত্যু হার হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাত শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হার হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে এবং বাংলাদেশ এমডিজি-গোল ৪ অর্জনে সন্তোষজনক অগ্রগতির জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছে। উল্লেখ্য, স্বাস্থ্যখাতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে সরকারের উদ্যোগ ও সাফল্য জাতিসংঘের নারী ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক সাউথ- সাউথ তথ্য প্রযুক্তি স্বীকৃতি প্রদান করেছে।

সারণি-১২.৩ এ ২০০৩ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত স্বাস্থ্য সূচক সমূহের প্রবণতা দেখানো হলোঃ

সারণি ১২.৩: স্বাস্থ্য সূচকসমূহের সাম্প্রতিক প্রবণতা

সূচকসমূহ	বিবেচ্য বিষয়	২০০৩	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১
স্থূল জন্ম হার (প্রতি হাজারে)	জাতীয়	২০.৯	২০.৬	২০.৭	২০.৬	২০.৬	২০.৫	১৯.৪	১৯.২	১৯.২
	শহর	১৭.৯	১৭.৮	১৭.৮	১৭.৫	১৭.৪	১৭.২	১৬.৮	১৭.১	১৭.৪
	পল্লী	২১.৭	২১.৬	২১.৭	২০.৭	২২.১	২২.৪	২০.৪	২০.১	২০.২
স্থূল মৃত্যু হার (প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৫.৯	৫.৮	৫.৮	৫.৬	৬.২	৬.০	৫.৮	৫.৬	৫.৫
	শহর	৪.৭	৪.৪	৪.৯	৪.৪	৫.২	৫.১	৪.৭	৪.৯	৫.৯
	পল্লী	৬.২	৬.১	৬.১	৬.০	৬.৬	৬.৫	৬.১	৫.৯	৫.৮
বিবাহের গড় বয়স	পুরুষ	২৫.৩	২৩.৩	২৩.২	২৩.৪	২৩.৬	২৩.৮	২৩.৮	২৩.৯	২৪.৯
	মহিলা	২০.৪	১৯.০	১৭.৯	১৮.১	১৮.৪	১৯.১	১৮.৫	১৮.৭	১৮.৬
ডাক্তার প্রতি জনসংখ্যা		৩৫৩২	৩১৩৭	৩২৬১	৩১১০	২৯৯১	২৮৬০	২৮৩২	২৭৮৫	২৮৬০
প্রত্যাশিত গড় আয়ুস্কাল (বছরে)	জাতীয়	৬৪.৯	৬৫.৯	৬৫.২	৬৫.৫	৬৬.৬	৬৬.৮	৬৭.২	৬৭.৭	৬৯.০
	শহর	৬৭.৬	৬৭.৮	৬৭.৯	৬৮.০	৬৮.১	৬৮.৩	৬৮.৭	৬৮.৯	৬৯.৯
	পল্লী	৬৪.৩	৬৪.৩	৬৪.৫	৬৫.৯	৬৬.০	৬৬.২	৬৬.৯	৬৭.৪	৬৮.৬
শিশু মৃত্যু হার (নবজাতক, < ১বছর, প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৫৩	৫২	৫০	৪৪	৪৩	৪১	৩৯	৩৬	৩৫
	শহর	৪০	৪১	৪৪	৩৮	৪২	৪০	৩৭	৩৫	৩২
	পল্লী	৫৭	৫৫	৫১	৪৭	৪৩	৪২	৪০	৩৭	৩৬
শিশু মৃত্যু হার (১-৪ বছর, প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৪.৬	৪.৫	৪.১	৩.৯	৩.৬	৩.১	২.৭	২.৬	২.৪
মাতৃ মৃত্যু হার (প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৩.৮	৩.৭	৩.৪৮	৩.৩৭	৩.৫১	৩.৪৮	২.৫৯	২.১৬	২.০৯
	শহর	২.৭	২.৫	২.৭৫	১.৯৬	২.১৯	২.৪২	১.৭৯	১.৭৮	১.৯৬
	পল্লী	৪.০	৩.৯	৩.৫৮	৩.৭৫	৩.৮৬	৩.৯৩	২.৮৫	২.৩০	২.১৫
গর্ভ নিরোধক ব্যবহারের হার (%)		৫৫.১	৫৬.০	৫৭.৮	৫৮.৩	৫৯.০	৫২.৬	৫৬.১	৫৬.৭	৫৮.৪
উর্বরতার হার (মহিলা প্রতি)		২.৬	২.৫	২.৪৬	২.৪১	২.৩৯	২.৩০	২.১৫	২.১২	২.১১

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

অর্থ বরাদ্দ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় উন্নয়নখাতে ৩২ টি অপারেশনাল প্লান সম্বলিত ১টি সেক্টর কর্মসূচি (HNPSDP), ২২টি চলতি বিনিয়োগ প্রকল্প, ২টি জেডিসিএফ প্রকল্প এবং ২টি চলতি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পসহ মোট ৫৯টি প্রকল্প/ কর্মসূচির অনুকূলে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে সংশোধিত এডিপিতে মোট ৩৬২২.৫৯ কোটি টাকা, (যার মধ্যে জিওবি ১৬৭৫.৭০ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহয্য ১৯৪৬৮৯ টাকা) বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে । এ বরাদ্দ পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে মোট ৪৬০.০৪ কোটি টাকা বা ১৫ শতাংশ বেশি। জানুয়ারি, ২০১৩ পর্যন্ত মোট ১৭৭০.৯০ কোটি টাকা অবমুক্ত হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ১০৯১.৮২ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৩০ শতাংশ। ২০১১-১২ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে অগ্রগতির হার ছিল ৯৫.৬১ শতাংশ।

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচি (HPNSDP)

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি (এইচপিএন) খাতের বিদ্যমান বাধাসমূহ দূর করে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ এবং পরিবারকল্যাণ, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য কর্মসূচিকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ২০১১-২০১৬ মেয়াদে ১৩,৫৭৩.১৬ কোটি টাকা প্রকল্প সাহায্য ও ৪৩,৪২০.৩৮ কোটি টাকা সরকারের অনুদানসসহ সর্বমোট ৫৬,৯৯৩.৫৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত "Health Population & Nutrition Sector Development Programme (HPNSDP)" শীর্ষক তৃতীয় সেক্টর কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত সমূহের সার্বিক উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব হবে। এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হ'ল-জনগণের বিশেষ করে মহিলা, শিশু ও সুবিধাবঞ্চিতদের স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি সেবা প্রাপ্তির চাহিদা বৃদ্ধি, কার্যকর সেবা প্রাপ্তি সহজলভ্য করা এবং স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি সেবাসমূহের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস; রোগের প্রাদুর্ভাব ও মৃত্যুহার হ্রাস এবং পুষ্টি মান বৃদ্ধি করা। এইচপিএন সেক্টরের উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবাকে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে কমিউনিটি ক্লিনিকসমুহকে সচল রেখে স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ ও পুষ্টি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া তিনস্তর বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কমিউনিটি পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে ।

এইচপিএনএসডিপি'র নতুন সংযোজন

- মা, নবজাতক ও শিশু-স্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনে ''ম্যাটারনাল, নিওনেটাল চাইল্ড এন্ড এ্যাডলোসেন্স হেল্থ কেয়ার'' শীর্ষক একটি পৃথক নতুন অপারেশনাল প্ল্যান (ওপি) গ্রহণ করা হয়েছে।
- দক্ষ ধাত্রীর সংখ্যা বাড়ানোর মাধ্যমে গর্ভপূর্ব, গর্ভাবস্থাকালীন, প্রসবকালীন ও সদ্য প্রসবোত্তর সেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্য সেবাকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে পর্যায়ক্রমে সকল সেবা কেন্দ্রে সার্বক্ষণিক (২৪/৭) জরুরি প্রসূতি সেবা (Emoc) এবং জরুরি প্রসবজনিত জটিলতার চিকিৎসা প্রদান করা হবে;
- যে সব এলাকায় মাতৃ-মৃত্যুর হার বেশী, ভৌগোলিক ও সামাজিক অবস্থার কারণে যাদের সেবা পেতে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে তাঁদেরকে এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মানসম্মত মাতৃ, নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হবে এবং মাতৃ ও নবজাতক মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখা হবে;
- কমিউনিটি ক্লিনিক ও বাড়ী বাড়ী সেবার মাধ্যমে গর্ভপূর্ব ও গর্ভকালীন নারী-বান্ধব স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হবে। প্রয়োজন অনুসারে বেসরকারি সংগঠনকে এ ধরণের সেবা প্রদানে উদ্বুদ্ধ করা হবে। এ পর্যন্ত ১৫০ টি উপজেলায় কমিউনিটি আইএমসিআই এর কর্মকান্ড সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছর পর্যন্ত ১৮৯৩ জন প্যারামেডিক্স ও ৬১৮ জন ডাক্তারকে আইএমসিআই ক্লিনিকাল ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে;
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সেবা কেন্দ্রের সুবিধাদি ও দক্ষতা বিনিময়ের মাধ্যমে মাতৃ ও নবজাতক স্বাস্থ্য সেবাসমূহের কার্যকর সম্পৃক্তকরণের বিস্তারিত গাইডলাইন তৈরি করা হবে। স্থায়ী পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতি এবং পরিবার পরিকল্পনার অপূরণকৃত চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা জোরদারসহ মাঠ পর্যায়ের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের মাঠ কর্মীদের ১৫১৫৩ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে;
- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, এনজিও সহ অন্যান্য স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীদের মাধ্যমে সমন্বিতভাবে নগরের বস্তি এলাকায় মাতৃও নবজাতক স্বাস্থ্য সেবা ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা জোরদার করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে একটি নবজাতক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে যা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে;
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের নিয়মিত মাতৃ, নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্য সেবার সাথে সমন্বিত ভাবে সারাদেশব্যাপী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পুষ্টি সেবা প্রদান করা হবে।পুষ্টি সেবা সংক্রান্ত কার্যক্রম স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতায় ''ন্যাশনাল নিউট্রিশন সার্ভিস (এনএনএস)'' শীর্ষক অপারেশনাল প্ল্যানের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে;
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বিতভাবে নগর এলাকায় পুষ্টি সেবা (যেমন, জনসচেতনতা বৃদ্ধি, ভিটামিন এ এবং অন্যান্য মাইক্রোনিউট্রিয়েট উপাদান) প্রদান করা হবে।

কমিউনিটি ক্লিনিক

গ্রামীণ জনগণ বিশেষত: দরিদ্র্য ও সুবিধাবঞ্চিতদের দোরগোড়ায় মানসম্মত প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৮ সালে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ১৯৯৮ সালে গ্রাম/ওয়ার্ড পর্যায়ে ৬০০০ জনের জন্য ১টি করে 'কমিউনিটি ক্লিনিক' স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং সে লক্ষ্যে ১৯৯৮-২০০১ পর্যন্ত সময়ে ১০,৭২৩টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মিত হয় এবং প্রায় ৮০০০ চালু করা হয়। পরবর্তীতে কমিউনিটি ক্লিনিক পুনরজ্জীবিতকরণের লক্ষ্যে ২০০৯ সালে পাঁচ বৎসর মেয়াদি (২০০৯-২০১৪) 'Revitalization of Community Health Care Initiative in Bangladesh' শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয় । উক্ত প্রকল্পের আওতায় মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত ১২,২৪৮টি ক্লিনিক চালু করা হয়েছে । এছাড়া নতুনভাবে ইতোমধ্যে ১,৫৭২ টির নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে এবং ৩৮৭ টির নির্মাণ কাজ চলছে। এছাড়া ৪,১৫০ টি কমিউনিটি ক্লিনিক সংস্কার ও মেরামত করা হয়েছে । কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে জানুয়ারি-ডিসেম্বর, ২০১২ সময়ে প্রায় ৭,২২,৩৩,৯৫২ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে এবং ১৬,৬০,৮৭২ জন রোগীকে উচ্চতর সেবা কেন্দ্রে রেফার করা হয়েছে ।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা

বিগত দুটি সেক্টর কর্মসূচি বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় তৃতীয় সেক্টর কর্মসূচির সংশ্লিষ্ট অপারেশনাল প্ল্যান বাস্তবায়নের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে মাঠকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবী-র মাধ্যমে ডায়রিয়া, ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, যক্ষা, কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ ও ভিটামিন 'এ' অভাবজনিত অন্ধত্ব দূরীকরণ, কৃমিনাশক ওষুধ বিতরণ ও টীকাদান ইত্যাদি কর্মসূচি জোরদার করা হয়েছে। এ সকল কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের হলে মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যু হার হ্রাস পাবে, গড় আয়ু বৃদ্ধি পাবে, রোগ প্রাদুর্ভাব হ্রাস পাবে। বর্তমানে দেশে Dengue, Swine Flu & SARS রোগগুলো দক্ষতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে। DOTS কার্যক্রমের মাধ্যমে Smear Positive ফুসফুসের যক্ষারোগ নির্ণয়ের হার প্রায় শতকরা ১০০ ভাগে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি ফাইলেরিয়া ও ম্যালেরিয়া রোগ ২০১৫ সালের মধ্যে নির্মূল করার পর্যায়ে আনা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই)

প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে সরকার সেক্টর কর্মসূচির মাধ্যমে ইপিআই কর্মসূচির আওতায় শিশুদেরকে রোগমুক্ত রাখার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। টিকার মাধ্যমে যেসব রোগ প্রতিরোধ করা যায়, তা প্রতিরোধ করে দেশকে রোগমুক্ত করার লক্ষ্যে ইপিআই কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি, ধনুষ্টংকার, পোলিও, হাম, যক্ষা ও হেপাটাইটিস-বি রোগ প্রতিরোধ করার জন্য টিকা প্রদান করা হচ্ছে। 'ইপিআই কভারেজ' এর আওতায় বর্তমানে সবগুলো টিকা প্রাপ্তির হার (এক বৎসরের নিচে) ৮৩ শতাংশে এবং (দুই বৎসরের নিচে) ৯২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এর মধ্যে বিসিজি ৯৯.১৯ শতাংশ, ওপিভি-৩ ৯৫.১ শতাংশ, পেন্টা-৩ ৯০ শতাংশ এবং হাম ৮৮.৫ শতাংশ (উৎসঃ Bangladesh EPI CES 2011)। এছাড়া, দেশকে পোলিওমুক্ত করার লক্ষ্যে জানুয়ারি ২০১২ সালে ২০তম জাতীয় টিকা দিবস পালন করা হয়েছে।

প্রজনন স্বাস্থ্য কর্মসূচি

বাস্তবায়িত সেক্টর কর্মসূচির মাধ্যমে এ পর্যন্ত প্রায় ১৩২ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জরুরি প্রসূতি সেবা (EMOC) চালু করা হয়েছে। 'মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচারস্কীম' কার্যক্রমের আওতায় ৪৬টি জেলার ৫৩টি উপজেলায় ৫,৬০,৫২৭ জনকে ভাউচার প্রদান করা হয়েছে। ২০১৬ নাগাদ আরও ১০০ টি উপজেলায় ভাউচার স্কিম কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে। কার্যকর প্রসূতি সেবা প্রদানের জন্য ১৪৪১ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র-কে Upgrade করা হয়েছে। কমিউনিটি পর্যায়ে সেবা প্রদান এবং মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার কমানোর লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায়ে কর্মরত পরিবার কল্যাণ সহকারী ও মহিলা স্বাস্থ্য সহকারীদের ধাত্রী বিদ্যায় ৬ মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে এবং এযাবত প্রায় ৭,১০৬ সিএসবিএ প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে কমিউনিটিতে কাজ করছেন । এছাড়া উপজেলা, জেলা হাসপাতাল ও মাতৃ ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রসমূহের ৩,০০০ জন প্রশিক্ষিত মিডওয়াইফ নিয়োগ করা

হবে।দেশের মোট ২৪ টি হাসপাতালকে "নারী বান্ধব" হাসপাতাল হিসেবে চিহ্নিত করে নারী যেন তার মর্যাদা ও সম্ভ্রম অক্ষুন্ন রেখে যথাযথ সেবা পেতে পারে তা নিশ্চিত করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থা এবং ই-হেলথ কর্মসূচি

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এম আই এস)এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য খাতেপ্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সূচনা করতে যাচ্ছে। জাতীয় পর্যায় থেকে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত স্বাস্থ্য নেটওয়ার্কের বিস্তার ঘটানোর জন্য এম আই এস কাজ করছে। সাধারণ জনগণের জন্য এম আই এস এর ওয়েব ঠিকানা হলোঃ www.dghs.gov.bd. এম আই এস বিভিন্ন স্বাস্থ্য অবকাঠামোর ব্যবহারোপযোগিতা, জন্ম হার, মৃত্যু হার, জরুরি প্রসূতি সেবার অবস্থা, সেবা প্রদানকারীর সংখ্যা ইত্যাদি তথ্য প্রদানসহ আরো যে সব সেবা প্রদান করে তা নিম্নরূপঃ

- মোবাইল ফোনে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে (মোট ৪৮২ টি হাসপাতাল) মোবাইল ফোনে ২০০৯ সালের মে মাস থেকে স্বাস্থ্য সেবা চালু আছে। প্রতিটি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে সেবা নিতে আসা জনগণ সেবা না পেলে সে বিষয়ে অভিযোগ জানাতে বা সেবার মান বাড়ানোর পরামর্শ দিতে এসএমএস ভিত্তিক কমপ্লেইন্ট /সাজেশন বক্স স্থাপন করা হয়েছে। সর্বনিম্ন উপজেলা পর্যন্ত দেশের প্রায় ৮০০ টি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। HPNSDP-র আওতায় কমিউনিটি ক্লিনিক পর্যায়ে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদানের কার্যক্রম শুরু করা হবে। ৮ টি হাসপাতালে টেলিমেডিসিন সুবিধা স্থাপন করা হয়েছে ।এর ফলে রোগীরা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারছেন;

- 'মিনি ল্যাপটপ হবে ডিজিটাল ডাক্তার' এই ধারণাকে সামনে রেখে কমিউনিটি ক্লিনিকে আগত রোগীদের টেলি মেডিসিন সেবা প্রদান, গ্রামীণ জনগণের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য ভান্ডার আপডেট করা, জনগণকে স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদানসহ স্বাস্থ্য জনশক্তির প্রশিক্ষণ ই-মেইল ইন্টারনেটের ব্যবহারের জন্য ১৩,৫০০ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে HPNSDP কর্মসূচি হতে পর্যায়ক্রমে ওয়েব ক্যামেরাযুক্ত মিনি ল্যাপটপ কম্পিউটার প্রদানের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে;

- জাতীয় টিকাদান কর্মসূচি, ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল সপ্তাহ,মায়ের দুধের পক্ষে প্রচারণার কর্মসূচিতে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীদের কাছে এস এম এস এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা প্রেরণ করা হয় । গর্ভবতী মায়েদের এস এম এস এর মাধ্যমে রেজিষ্ট্রেশন করে গর্ভবতী মায়েদের বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ পেতে পারেন। গত তিন বছরে প্রায় অর্ধ লক্ষ জনবলকে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ।

বীমা

স্বাস্থ্য খাতে বিকল্প অর্থায়নের সুযোগ সৃষ্টি, সমাজের দরিদ্র্য জনগোষ্ঠির উন্নত স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে আর্থিক প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ এবং স্বাস্থ্য খাতে দক্ষতা অর্জন ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশে স্বাস্থ্য বীমা পরীক্ষামূলকভাবে চালু করার বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বর্তমানে তিনস্তর বিশিষ্ট স্বাস্থ্যবীমা নীতি সুপারিশ করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে, দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থিত জনগোষ্ঠীকে একটি "স্বাস্থ্য কার্ড" প্রদান করা হবে যার মাধ্যমে তারা উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহ থেকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা পাবে। ইতোমধ্যে তিনটি উপজেলাকে পাইলট ভিত্তিতে এই কার্যক্রম চালানোর জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এই কার্যক্রম দেশব্যাপী সম্প্রসারিত হবে।

পুষ্টি সেবা

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষমাত্রার ১, ৪ ও ৫ নং টার্গেট পূরণ করা পুষ্টি সেবার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। সারাদেশে কমিউনিটি ও ফ্যাসিলিটি পর্যায়ে পুষ্টি সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত "ন্যাশনাল নিউট্রিশন সার্ভিসেস (এনএনএস)" শীর্ষক একটি "অপারেশনাল প্ল্যান ২০১১ থেকে ২০১৬" পর্যন্ত বাস্তবায়নের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হ'ল; স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের সেবা প্রতিষ্ঠান, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সহায়তায় অপুষ্টিজনিত ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির মাঝে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় পুষ্টি সেবা প্রদান; দৈহিক

পুষ্টি আহরণের পাশাপাশি ব্যক্তিগত পরিচর্যা, খাদ্যাভাস পরিবর্তন ও পুষ্টিসমৃদ্ধ জীবন প্রণালী প্রবর্তনের জন্য সচেতনতা গড়ে তোলা এবং অপুষ্টি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শিশু ও মাতৃ মৃত্যু হার কমানো ।

তাছাড়া ভিটামিন 'এ', আয়োডিন, ভিটামিন 'ডি', জিঙ্ক, ক্যালসিয়াম ইত্যাদির অভাব পূরণের জন্য বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। উল্লেখ্য, ভিটামিন-এ এর অভাবজনিত অপুষ্টি নিয়ন্ত্রণে সারাদেশব্যাপী ৫ বছর বয়স পর্যন্ত ৩০ লাখ শিশুকে মার্চ, ২০১৩ এ ভিটামিন এ ক্যাপ্সুল ও কৃমিনাশক খাওয়ানো হয়। বর্তমানে দেশে ৯-১১ মাস বয়সি শিশুর ৮৫.২ শতাংশ এবং ১২-৫৯ মাস বয়সি শিশুর ৯২.২ শতাংশ ভিটামিন -এ প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়েছে। শিশুদের ছয় মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র মায়ের দুধপান, এবং কমিউনিটি ক্লিনিকের বিদ্যমান কার্যক্রমের সাথে পুষ্টি কার্যক্রমকে সম্পৃক্ত করে কমিউনিটি পর্যন্ত পুষ্টি সেবা বিস্তৃত করা। মারাত্মক অপুষ্টি দূর করার জন্য উপজেলা, জেলা এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মাধ্যমে স্যাম (SAM) কার্যক্রম এবং কমিউনিটি পর্যায়ে আই, এম,সি,আই (IMCI) কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/এনজিওদের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে শহরের বস্তি এবং দূর্গম এলাকায় পুষ্টি কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত ও জোরদার করা।

সারণি ১২.৪ : বাংলাদেশে পুষ্টি পরিস্থিতির তুলনামূলক চিত্র

সূচক	২০০৭	২০১১
কম ওজনের শিশু (%)	৪১	৩৬
খর্বাকৃতি শিশু (%)	৪৩	৪১
শিশুর মাতৃদুগ্ধ পানের হার (%)	৪৩	৬৪
শিশুকে মাতৃদুগ্ধ প্রদানকারী মায়ের আয়রণ ট্যাবলেট ও ভিটামিন-এ প্রাপ্তির হার (%)	৯৮	১০০

উৎসঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয়।

স্বাস্থ্য অবকাঠামো

ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবা সম্প্রসারনের জন্য এ পর্যন্ত ৩৮৮১ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং ৪২১ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মিত হয়েছে। ২০১০-১১ অর্থ বছর পর্যন্ত ৫৩ টি স্বাস্থ্য অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। কুমিল্লায় মেডিকেল কলেজের ১২০ শয্যা বিশিষ্ট ছাত্র হোস্টেল নির্মাণ, ২৫০ শয্যা হতে ৫০০ শয্যায় উন্নীতকরণ, ট্রমা সেন্টার নির্মাণ, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ৫০০ শয্যা হতে ১০০০ শয্যায় উন্নীতকরণ এবং ঢাকার খিলগাঁওস্থ ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ । এছাড়া HNPSP এর আওতায় ১৩ টি ক্লাস্টার প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে; এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ ৫ টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আইসিইউ এবং ক্যাজুয়ালিটি ইউনিট স্থাপন, দেশের ২৫৬ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ শয্যা হতে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ , দেশের ৩ টি ইন্সটিটিউট অব হেল্থ টেকনোলজী ইত্যাদি নির্মাণ কাজ সমাপ্তকরণ এবং ৫ টি মেডিকেল কলেজ (নোয়াখালী, কক্সবাজার, পাবনা , যশোর ও রাঙ্গামাটি) নির্মাণ কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ২২ টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। কুর্মিটোলা ৫০০ শয্যা জেনারেল হাসপাতাল নির্মান সম্পন্ন করে চালু করা হয়েছে। এছাড়া খিলগাঁও ৫০০ শয্যা জেনারেল হাসপাতাল নির্মাণ শেষ হয়েছে এবং অচিরেই চালু হবে। ২০১১-১২ অর্থবছরে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ খাতে বরাদ্দ ছিলো ৩৩৪.৩১ কোটি টাকা এবং তন্মধ্যে ব্যায় করা হয়েছে ৩২২.৯০ কোটি টাকা। ব্যয়ের অঙ্ক প্রায় ৯৭ শতাংশ।

চিকিৎসা শিক্ষা

মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের চিকিৎসা বিজ্ঞানে শিক্ষা লাভের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। বিভিন্ন বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান ছাড়াও মেডিকেল কলেজগুলোতে স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করা হয়েছে ও পাঠ্যক্রম অব্যাহত আছে। চিকিৎসা শিক্ষা কার্যক্রমের কারিকুলাম হালনাগাদ ও গণমুখী করা হয়েছে।দেশের সরকারি পর্যায়ে মোট ২১টি মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস কোর্সে ছাত্রছাত্রী ভর্তি সংখ্যা ২০১১-১১২ শিক্ষাবর্ষে ২,৪৯৪ (Armed Forces Medical College Hospital সহ) এ উন্নীত করা

হয়েছে। নতুন নতুন মেডিকেল কলেজ স্থাপনের মাধ্যমে বেসরকারি পর্যায়ে চিকিৎসা শিক্ষা উৎসাহিত করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে সরকারি পর্যায়ে আরো ৭টি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি স্থাপনের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত চিকিৎসা সহযোগী দক্ষ জনবল সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হয়েছে। বেসরকারি মেডিকেল কলেজে মেধাবী ছাত্রছাত্রী ভর্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করে মেধা তালিকা অনুযায়ী ভর্তি কার্যক্রম চলছে।

বেসরকারি স্বাস্থ্যখাত

বর্তমানে বেসরকারি খাতে ৫৪টি মেডিকেল কলেজ, ১৪টি ডেন্টাল কলেজ, এবং ৫৩,৪৪৮টি শয্যাসহ ২,৯৬৬টি বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিক রয়েছে। চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যখাতে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি ৫৭২১টি উন্নতমানের ডায়াগনস্টিক সেন্টার উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে এনজিওদের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচির আওতায় এইচআইভি/এইডস ও পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নে বেশ কিছু এনজিও সম্পৃক্ত রয়েছে। অনুমোদিত ৫২টি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি হতে সহযোগী মানবসম্পদ তৈরি করা হচ্ছে। দেশে বর্তমানে ৪১টি ব্লাড ব্যাংক চালু আছে।স্বাস্থ্য খাতে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) এর আওতায় দেশের দুটি সরকারি হাসপাতালে (চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনি ডিজিস এন্ড ইউরোলজি (নিকডো)) কিডনি ডায়ালাইসিস সেন্টার সম্প্রসারণের কাজ চলছে।

পরিবার পরিকল্পনা সেবা

বাংলাদেশের দুর্বল আর্থসামাজিক অবস্থা এবং শিক্ষার হার কম হওয়া সত্ত্বেও এ যাবত পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির সবচেয়ে বড় সাফল্য হচ্ছে আধুনিক ও কার্যকরি জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ। ২০১৬ সালের পূর্বে প্রতিস্থাপনযোগ্য জন উর্বরতা নিশ্চিত করা সরকারের মূল লক্ষ্য এবং এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বর্তমানের মোট প্রজনন হার ২.৩ থেকে ২০১৬ সাল নাগাদ ২.০০ এ নামিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে, যার অন্যতম হল পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহীতার হার ৬১ শতাংশ থেকে ২০১৬ নাগাদ ৭৪ শতাংশ এ উন্নীত করা। অন্যান্য পদক্ষেপগুলোর মধ্যে স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতিগ্রহীতা বাড়ানো, বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে দেরিতে প্রথম সন্তান গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা ইত্যাদি উল্লেখ্যযোগ্য ।

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতায় জাতীয় পর্যায়ে এমসিএইচটিআই আজিমপুর ও এমএফটিসি মোহাম্মদপুর, ঢাকা; জেলা পর্যায়ে ৬০ টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র; উপজেলা পর্যায়ে ৪২৭ টি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের এমসিএইচ-এফপি ইউনিট এবং ১২ টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র ; ইউনিয়ন পর্যায়ে ৩৮৬০ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কেন্দ্র এবং ২৪ টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র; ১০৭২৩ টি কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ৩০,০০০ টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা সেবাসহ মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। শহরের বস্তি এলাকা, চরাঞ্চল, দুর্গম এলাকা, অনগ্রসর পল্লী অঞ্চল ও হাওড় এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম জোরদার করার জন্য এলাকাভিত্তিক কর্মকৌশল প্রণয়ন করে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কার্যকর প্রসূতি সেবা প্রদানের জন্য এ পর্যন্ত ১৪৪১ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মান উন্নয়ন করা হয়েছে। এ সকল মান উন্নীত কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারির ব্যবস্থা করা হবে। ক্রয়/ সংগ্রহ ও সরবরাহ অবস্থা ট্র্যাকিং করার জন্য Supply Chain Information Portal নামে একটি ওয়েব ভিত্তিক সফটওয়ার স্থাপন করা হয়েছে।

নার্সিং সেবা

দেশে বর্তমানে ৩০,৪১৮ জন রেজিস্টার্ড নার্স আছে, তার মধ্যে ১৫,৭০৯ জন নার্স সরকারি চাকুরিতে রয়েছে । ৩০০০ জন ধাত্রীকে মিডওয়াইফারি প্রশিক্ষণ প্রদানের অংশ হিসেবে ১৭৪ জন রেজিস্টার্ড নার্সকে ০৬ মাস মেয়াদি সার্টিফাইড মিডওয়াইফারি কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, দেশে ৪৩ টি সরকারি নার্সিং ইনস্টিটিউট এবং ৩৯ টি বেসরকারি নার্স ইনস্টিটিউট রয়েছে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দেশে ১০ টি সরকারি নার্সিং কলেজ এবং ২১ টি বেসরকারি নার্সিংকলেজ রয়েছে। এছাড়া বেসরকারি পর্যায়ে ৩৯টি নার্সিং ইনস্টিটিউট, ৯টি নার্সিং কলেজ ও ৫টি পোষ্ট বেসিক নার্সিং কলেজ রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রটোকল অনুসারে ডাক্তার ও নার্সের অনুপাত হওয়া প্রয়োজন ১:৩। কিন্তু বাংলাদেশে এ অনুপাত ২:১। নার্সিং সেবা উন্নয়নে বর্তমান সরকার নানামুখী উন্নয়ন কর্মকান্ড গ্রহণ করেছে। দেশে অভিজ্ঞ নার্সের সংখ্যা বৃদ্ধির

লক্ষ্যে ঢাকাস্থ শেরে বাংলানগরে একটি এমএসসি নার্সিং কলেজ চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে ২০১৬ নাগাদ দেশে নার্স এর সংখ্যা ৪০,০০০ এ উন্নীত করা সম্ভব হবে।

ঔষধ প্রশাসন ও ঔষধ শিল্প

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর বাংলাদেশের ঔষধ নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ। ঔষধ শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল, প্যাকিং ম্যাটেরিয়ালস আমদানি, ঔষধ উৎপাদন, বিপনন, লাইসেন্স প্রদান, মূল্য নির্ধারণ, আয়ুর্বেদিক, ইউনানি হোমিওপ্যাথিকসহ সকল ঔষধের রেজিস্ট্রেশন প্রদান ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর এর আওতাভুক্ত কাজ। ঔষধের গুণগত মান রক্ষায় নমুনা পরীক্ষা/বিশ্লেষণের জন্য বর্তমানে ২টি সরকারি ঔষধ পরীক্ষাগার রয়েছে। ঢাকার মহাখালিতে আর্ন্তজাতিক মানের আধুনিক ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবেরেটরি ও ন্যাশনাল কন্ট্রোল ল্যাবেরেটরি স্থাপন করা হয়েছে। দেশিয় চাহিদার প্রায় ৯৭ ভাগেরও বেশী ঔষধ বর্তমানে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হয়। এর পাশাপাশি ১৮৭টি ব্রান্ডের বিভিন্ন প্রকারের ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের প্রায় ৮৭টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। গত কয়েক বছরে বাংলাদেশের ঔষধ শিল্প খাত দ্রুত বাড়ছে। ২০১১ সালে ৪৮০ কোটি টাকার এবং ২০১২ সালের জুন পর্যন্ত ২০০ কোটি টাকার ঔষধ রপ্তানি হয়েছে। জাতীয় ঔষধ নীতি-২০০৫ আধুনিকায়ন করা হয়েছে এবং ঔষধ নিয়ন্ত্রণ আইন-১৯৮২ এর রিভিউ এর কাজ চলছে। প্রান্তিক ব্যবহারকারীদের নিকট ক্রয়সাধ্য মূল্যে অত্যাবশ্যকীয় ঔষধসমূহ সহজলভ্য করার জন্য ঔষধের তালিকা পুনঃমূল্যায়ন ও মূল্য নির্ধারণ নীতিমালা সংশোধন করা হচ্ছে। এছাড়া ওষুধের কাঁচামাল উৎপাদনে দেশি ও বিদেশি উদ্যেক্তাদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ঢাকার অদূরে গজারিয়ায় একটি এপিআই (একটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট) পার্ক স্থাপনের কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

স্বাস্থ্য খাতের সংস্কার

স্বাস্থ্য খাতকে যুগোপযোগী ও আধুনিক করার জন্য স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কার্যক্রমের আওতায় বেশ কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রধান সংস্কার কার্যক্রমগুলো হলোঃ

- ইতোমধ্যে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি এবং জাতীয় জনসংখ্যা নীতি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে;
- হেলথ এডভোকেসি এবং মাতৃ ভাউচার স্কিম এর মত কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবার চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি করা হচ্ছে;
- সেক্টর ওয়াইড প্রোগ্রাম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য খাতকে শক্তিশালী করা হচ্ছে;
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রমের মাধ্যমে পুষ্টি সেবাকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করে সারাদেশে পুষ্টি কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে;
- ক্রমান্বয়ে সকল জেলা ও বিশেষায়িত হাসপাতালে ICU/CCU সেবা চালু করার কার্যক্রম চলছে;
- কমিউনিটি ক্লিনিক সমূহের নেতৃত্বে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার সম্প্রসারণ করা হচ্ছে;
- কমিউনিটি ক্লিনিকসহ সকল স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে ই-হেলথ চালু করার কাজ হাতে নেয়া হয়েছে;
- দূর্গম এলাকাসমূহ নির্দিষ্ট করে প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে;
- পিপিপি-র অধীনে কার্যক্রম চালু করার পরিকল্পনা করা হবে;
- জন্ম নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করার লক্ষ্যে স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি জোরদার, পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদা (Unmet Need) পূরণসহ এলাকা ও লক্ষ্য ভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা সেবা কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে;
- অগ্রাধিকার চিহ্নিত করে প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্বিন্যাস ও নীতিসমূহের সংস্কার সাধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
- বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন,দুর্গম এলাকার সেবা প্রদানকারী্দের বিভিন্ন প্রণোদনা প্রদান এবং সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে;
- স্থানীয় সরকার বিভাগ ও বিভিন্ন এনজিওদের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নগরে স্বাস্থ্য,পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা সম্প্রসারিত ও জোরদার করা হচ্ছে।

নারী ও শিশু উন্নয়ন কার্যক্রম

নারী ও শিশুদের অবস্থার উন্নয়নে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ তিনটি সংস্থা যথা: মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমির মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিগত ১৯৭৫ সালে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে ১৯৭৬-১৯৮৫ সালকে 'নারী দশক' হিসেবে ঘোষণার প্রেক্ষাপটে নারী উন্নয়নে সরকারের জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক অঙ্গীকারের প্রতিফলন হিসেবে বাংলাদেশের সর্বস্তরের মহিলাদের সার্বিক উন্নয়ন ও তাদের অবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি জাতীয় মহিলা সংস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলা ও ৫০টি উপজেলায় সংস্থার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। জাতীয় মহিলা সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহিলাগণের সচেতনতা বৃদ্ধি তথা মহিলাদের জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করাসহ অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জন। এ ছাড়া, মহিলাদের আইনগত অধিকার রক্ষার্থে সাহায্য করা, মহিলা কল্যাণে নিয়োজিত সরকারি ও বেসরকারি, দেশি বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন ; জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে মহিলাদের সম্পৃক্ত করা; সমবায় সমিতি গঠন ও কুটির শিল্প স্থাপনে মহিলাদের উৎসাহিত করা ; ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা ইত্যাদি। জাতীয় মহিলা সংস্থার ৬৪টি জেলা এবং ৫০টি উপজেলা শাখার মাধ্যমে নিরক্ষর মহিলাদের অক্ষরজ্ঞান দান, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার কল্যাণ, আইনগত অধিকার, পরিবেশ সংরক্ষণ, নৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। অনগ্রসর,অবহেলিত,বেকার মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয়বর্ধক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে জাতীয় মহিলা সংস্থা দর্জিবিজ্ঞান, এমব্রয়ডারি, ব্লক- বাটিক, চামড়াজাত শিল্প ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

নারী উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম

জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন, নারী নির্যাতন বন্ধ, নারী পাচার প্রতিরোধ, কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বিধান এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মূল স্রোতধারায় নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাসহ নারীর সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তা নিম্নরূপঃ

অক্টোবর/২০০৮ হতে সেপ্টেম্বর/২০১৩ মেয়াদে ১৮৮১.৯৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'নগর ভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প', ১৬৭৫.৪৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ''জেলা ভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ (২য় পর্যায়)'' প্রকল্প, জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১৫ মেয়াদে ১৩৮৪.৫০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ''অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া, ১২৩৪.২৩ লক্ষ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে ''জাতীয় মহিলা সংস্থা জেলা কমপ্লেক্স'' শীর্ষক একটি প্রকল্প জুলাই ২০১১ থেকে ডিসেম্বর ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৫টি জেলায় (গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নড়াইল, দিনাজপুর) নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৪টি জেলা শাখায় ভৌত নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও নারীর আইনগত অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে জাতীয় মহিলা সংস্থার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে একটি ''নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল'' আছে। নির্যাতিত মহিলাগণ এ সেলের মাধ্যমে বিনা খরচে আইনগত সহায়তা পেয়ে থাকে। মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মোট ১০৮ টি শাখা অফিসের মাধ্যমে মাথাপিছু ৫০০০ টাকা থেকে ১৫০০০ টাকা ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। তাছাড়া, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ তহবিল হতে প্রাপ্ত ১২০.০০ লক্ষ টাকার (এককালীন) তহবিল (আর্বতক) দ্বারা পরিচালিত স্ব-কর্ম সহায়ক ঋণ কার্যক্রমের আওতায় দরিদ্র, বেকার ও উদ্যোগী মহিলাদের আত্ন-কর্মসংস্থানের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। তাছাড়া, অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় ফেব্রুয়ারি, ২০১১ থেকে জুন, ২০১৩ মেয়াদে ৬২৮.৯৬ লক্ষ টাকা এবং ৬৫০.৬১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দুটি কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে।

তথ্য আপাঃ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্প

নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জুলাই ২০১১ থেকে জুন ২০১৪ মেয়াদে ''তথ্য আপা" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ১২০২.২৯ লক্ষ টাকা। দেশের ১০টি উপজেলা তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সুবিধাদি সর্ম্পকে মহিলাদের সচেতন করা ও তথ্য জগতে তাদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে আত্মনির্ভরশীল হতে সহায়তা করাই এ প্রকল্পের মূল

উদ্দেশ্য। তথ্য কেন্দ্রসমূহ চালু করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সহকারী তথ্য আপা ও জুনিয়র সহকারী তথ্য আপা নিয়োগদান করা হয়েছে। সর্বমোট ১,০০,০০০(এক লক্ষ) মহিলাকে তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের আওতায় আনা হবে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের অনুকূলে ৩০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

শিশু উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম

শিশুদের মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে এবং শিশু কল্যাণে শিশুর সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ,পুষ্টি, শিক্ষা ও বিনোদনের কোন বিকল্প নেই । তাই শিশু-কিশোর কল্যাণে জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী শিশু অধিকার সংরক্ষণ, শিশুর জীবন ও জীবিকা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনাসহ শিশু নির্যাতন বন্ধ, বিশেষ করে কন্যাশিশুদের বৈষম্য বিলোপ সাধনে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় যেসব প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে তা নিম্নরূপঃ

- **শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা** প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী দেশের ৬৪টি জেলায় শিশুর মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে বিভিন্নমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের আওতায় ২০১১-১২ অর্থ বছরে ১৫০টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। দেশব্যাপী ৪-৫ বছর বয়সি প্রায় ৮ লক্ষ শিশুকে ৮,৭৩১টি কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।
- **সিসিমপুর আউটরিচ** শীর্ষক প্রকল্পটি জানুয়ারি, ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত সময়ে ২২৪৪.৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০৩-০৬ বছর বয়সী শিশুদের স্বাক্ষরতা, সংখ্যার ধারণা, বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা এবং মনোসামাজিক বিষয়ের ধারণার মাধ্যমে মানসম্মত শিখন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- **ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ফর মনিটরিং চাইল্ড রাইটস** প্রকল্পের আওতায় শিশু অধিকার সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণের বিষয়ে ডাটা ব্যাংক স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তাছাড়া, ইউনিসেফ বাংলাদেশের সহায়তায় "ন্যাশনাল প্ল্যান অব একশন ফর চিল্ড্রেন (২০০৫-২০১০)" কে রিভিউ করে বাংলাদেশে শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ কাঠামো, নির্দেশকসমূহ ও নির্দেশাবলী ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া, শিশুশ্রম নিরসনকল্পে "**জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০"** প্রণয়ন করা হয়েছে । শিশুশ্রম নিরসন বর্তমান বিশ্বে একটি স্পর্শকাতর বিষয়। দেশে বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প কারখানা হতে শিশু শ্রম নিরসনের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এ লক্ষ্যে বাস্তবায়িত প্রকল্পের আওতায় ৪০,০০০ শিশু শ্রমিককে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানসহ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত শিশু শ্রমিকদের ৫,০০০ জন পিতা-মাতাকে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ৩.৫৬ কোটি টাকার ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ের মাধ্যমে ৫০,০০০ শিশু শ্রমিককে ২৪ মাসব্যাপি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ৯টি ট্রেডে ৬ মাসব্যাপি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। নেদারল্যান্ডস সরকারের আর্থিক সহায়তায় ৭১৩৯.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন শেষে প্রায় ৫৫,০০০ শিশু শ্রমিককে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে বিরত রাখা সম্ভব হবে এবং ২৬,০০০ জন শিশু শ্রমিককে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ১৩,০০০ জনকে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হবে। একই প্রকল্পের আওতায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে শ্রম উইং-এর তত্ত্বাবধানে চাইল্ড লেবার ইউনিট (CLU) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দেশে শিশুশ্রম নিরসন সংক্রান্ত সকল নীতি ও কার্যক্রম পরিকল্পিত ও সমন্বিতভাবে সম্পাদনের ক্ষেত্রে শিশুশ্রম ইউনিট অনুঘটকের দায়িত্ব পালন করছে। এ ছাড়াও দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এবং সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মতো উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে শিশুশ্রম নিরসনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্তকরণের বিষয়ে CLU উদ্যোগী ভূমিকা পালন করবে।

অর্থ বরাদ্দ

২০১২-১৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০ টি (বিনিয়োগ প্রকল্প:১৩টি ও কারিগরি সহায়তা প্রকল্পঃ ৭টি) প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ রয়েছে ১৯৮.২৮ কোটি টাকা ।

সমাজকল্যাণ

দেশের দুঃস্থ, দরিদ্র ও অসহায় এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সার্বিক অবস্থার উন্নয়নের ওপর দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি বহুলাংশে নির্ভর করে । সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের দরিদ্র ও অসহায় এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অপরাধপ্রবণ কিশোরদের সংশোধন, সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের পুনর্বাসন, দুঃস্থ ও অসহায় ছেলে-মেয়েদের লালনপালন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণসহ পুনর্বাসন, পরিত্যক্ত নবজাতক শিশুদের লালন-পালন, ভবঘুরে পুনর্বাসন, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান, নিরাপদ আবাসনসহ বহুবিধ কার্যক্রম সমগ্র দেশব্যাপী পরিচালনা করছে।

কল্যাণ ও সেবামূলক কার্যক্রম

কল্যাণ ও সেবামূলক কার্যক্রমের মধ্যে হাসপাতাল সমাজসেবা/চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম, সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রম, দৃষ্টি ও শ্রবণপ্রতিবন্ধীদের বিদ্যালয়, ব্রেইল প্রেস, প্লাস্টিক সামগ্রী উৎপাদন কেন্দ্র, মিনারেল ওয়াটার প্লান্ট ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র অন্যতম। গরীব ও অসহায় রোগীদের সেবা দানের জন্য হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম ২০১১-১২ অর্থ বছরে মোট ৪,৭২,৪৬১ জন গরীব রোগীকে ৯০টি ইউনিটের মাধ্যমে আর্থিক সহযোগিতা, মনস্তাত্ত্বিক ও চিকিৎসা সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের নিজস্ব পরিবেশে এবং স্থানীয় শিক্ষালয়ে চক্ষুষ্মান শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সমন্বিত শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে ৬৪ টি জেলা শহরে সমন্বিত অন্ধশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্লাস্টিক সামগ্রী উৎপাদন কেন্দ্র মৈত্রী শিল্পসহ দেশের সর্বপ্রথম মিনারেল/ ড্রিংকিং ওয়াটার প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। এ প্লান্টের আওতায় উৎপাদিত 'মুক্তা' নামের মিনারেল/ ড্রিংকিং ওয়াটারের চাহিদা বাজারে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ কার্যক্রম

দেশের বিপুল সংখ্যক অপরাধপ্রবণ কিশোর-কিশোরীদের চরিত্র সংশোধনপূর্বক সমাজে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে শিশু আইন, ১৯৭৪, শিশু বিধিমালা, ১৯৭৬ এবং জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ প্রণয়ণের মাধ্যমে সমাজসেবা অধিদপ্তর বিভিন্ন কাজ করে আসছে। এ যাবত তিনটি কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে উপকারভোগীর সংখ্যা ১৬,১২১ জন। প্রথম অপরাধ ও লঘু অপরাধে দন্ডিত অথবা বিচারাধীন অপরাধীদের জন্য প্রবেশন ও আফটার কেয়ার সার্ভিসেস এর মাধ্যমে পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে যার মাধ্যমে এ পর্যন্ত উপকৃতের সংখ্যা যথাক্রমে ১২,৩৬৭ জন ও ৩৮,২৯৯ জন। সমাজসেবা অধিদপ্তর ভবঘুরেদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য ৬টি সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র পরিচালনা করছে। এছাড়া, আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু-কিশোরীদের জন্য দেশে ৬টি মহিলা ও শিশু-কিশোরীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থ বছরের জুন ২০১২ পর্যন্ত ৬টি সরকারি আশ্রয় কেন্দের মাধ্যমে ২০৫ জনকে পুনর্বাসন করা হলেও শুরু হতে এ পর্যন্ত পুনর্বাসনের সংখ্যা ৫০,৩৪২ জন। সেফ হোম এর মাধ্যমে শুরু হতে এ পর্যন্ত উপকৃতের সংখ্যা ৫,০৬২ জন।

প্রশিক্ষণ, গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রচার ও প্রকাশনা কার্যক্রম

মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সমাজসেবা অধিদপ্তরের জনবল ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য ৬টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। এছাড়া, সমাজসেবা অধিদপ্তরের কার্যক্রমের উপর নীতিমালা, বুকলেট, ব্রোসিওর, কার্যক্রম পরিচিতি, সমাজকল্যাণ বার্তা ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

মানবসম্পদ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

দেশে বর্তমানে ৮৫টি সরকারি শিশু পরিবারের মাধ্যমে ১০,৩০০ জন এতিম শিশুর ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০১১-১২ অর্থ বছরে বেসরকারি পর্যায়ে পরিচালিত নিবন্ধিত এতিমখানায় প্রতিপালিত শিশুদের মধ্যে মাসিক মাথাপিছু ১০০০ টাকা হারে ৬৩০ মিলিয়ন টাকা ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট হিসেবে বিতরণ করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে ৫২,৪০০ জন এতিম শিশু উপকৃত হচ্ছে ।

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন'এর তথ্যাদি ও পরিসংখ্যান

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের অনগ্রসর, বঞ্চিত, দরিদ্র, অসহায়, প্রতিবন্ধী, অটিস্টিক ও সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কল্যাণ, উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য বহুমাত্রিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন নিবন্ধিত হয় এবং এর সংঘস্মারক ও গঠনতন্ত্র প্রণীত হয়।

ফাউন্ডেশন গঠিত হওয়ার প্রাক্কালে ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে সিডমানি হিসেবে প্রথম ১০.০০ (দশ কোটি) টাকা এবং পরবর্তীতে সিডমানি হিসেবে পর্যায়ক্রমে আরও ২৫.০০ (পঁচিশ কোটি) টাকার মঞ্জুরি পাওয়া যায়। সিডমানি বিভিন্ন ব্যাংকে সরকারি নিয়মে লগ্নী করা হয়েছে যার বর্তমান স্থিতি ৫২.৯০ কোটি টাকা। দেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, হিয়ারিং টেস্ট, ভিজুয়্যাল টেস্ট, কাউন্সেলিং, প্রশিক্ষণ, সহায়ক উপকরণ প্রদান ও প্রয়োজন মোতাবেক অন্যান্য সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে প্রথমবারের মতো ঢাকা, ময়মনসিংহ (ভালুকা), জামালপুর, কিশোরগঞ্জ (ভৈরব) ও মানিকগঞ্জ (সিংগাইর) জেলায় সরকারি অর্থায়নে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চালু করা হয়। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে পূর্ববর্তী অর্থ বছরসমূহের কার্যক্রম নবায়নসহ আরো ২৩ জেলা/উপজেলায় সরকারি অর্থায়নে উক্ত কর্মসূচি সম্প্রসারণ করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় আরো ১০টি জেলায় উক্ত কর্মসূচি সম্প্রসারণ করার জন্য ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রগুলোতে বিদ্যমান প্রশিক্ষিত জনবলের সমন্বয়ে ০১-১০-২০১২ সময়ে একটি করে 'Autism Corner' স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত জনবল অটিজমের শিকার শিশু/ব্যক্তিবর্গকে উক্ত সেন্টার থেকে বিনামূল্যে নিয়মিত থেরাপি, রেফারেল ও কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করে থাকে।

অটিজম রিসোর্স সেন্টার

২০১০ সালে তৃতীয় বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উদযাপনকালে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ফাউন্ডেশনের নিজস্ব ক্যাম্পাসে অটিজম রিসোর্স সেন্টার যাত্রা শুরু করে। ২০১০ সালে চালু হওয়ার পর থেকে এ যাবৎ ৫০০ জন অটিজমের শিকার শিশু/ব্যক্তিকে বিনামূল্যে ম্যানুয়াল ও Instrumental থেরাপি সার্ভিস প্রদান করা হয়েছে।

অটিস্টিক স্কুল

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ২০১১ সালে একটি সম্পূর্ণ অবৈতনিক অটিস্টিক স্কুল চালু করা হয়েছে। ৩০টি দরিদ্র পরিবারের ৩০ জন অটিস্টিক শিশুকে এ স্কুলের মাধ্যমে বিশেষ পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ১৫৪৮০.৪৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০৮ থেকে জুন ২০১৪ মেয়াদে 'Promotion of Services and Opportunities to the Disabled Persons in Bangladesh' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। চলতি ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ফাউন্ডেশনের আওতায় বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সম্বলিত আরো ১০টি ভ্রাম্যমান থেরাপি ভ্যান সংগ্রহের জন্য ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ভ্রাম্যমাণ ওয়ান স্টপ থেরাপি সার্ভিস

প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, হিয়ারিং টেস্ট, ভিজুয়্যাল টেস্ট, কাউন্সেলিং, প্রশিক্ষণ, সহায়ক উপকরণ ইত্যাদি সহায়তা দেয়ার লক্ষ্যে ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ২০১০ সালে প্রথমবারের মতো ভ্রাম্যমাণ ওয়ান স্টপ থেরাপি সার্ভিস চালু করা হয়েছে। চলতি ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ফাউন্ডেশনের আওতায় বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সম্বলিত আরো ১০টি ভ্রাম্যমান থেরাপি ভ্যান সংগ্রহের জন্য ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার আইন এবং প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত কার্যক্রমঃ বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা-২০০৯

জাতিসংঘ ঘোষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ (ইউএনসিআরপিডি) এর প্রতি সমর্থন প্রদানকারী প্রথম সারির দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের ক্ষমতায়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইউএনসিআরপিডি'র সাথে

সঙ্গতি রেখে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার আইন' শিরোনামে একটি নতুন আইনের খসড়া ইতোমধ্যে সরকারের মন্ত্রিসভায় নীতিগত অনুমোদন লাভ করেছে। তাছাড়া সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত 'প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা'র আওতায় সুইড বাংলাদেশ এর ৪৮ টি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুল এবং বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন এর ৭টি ইনক্লুসিভ স্কুল ২০১০ সাল থেকে সরকারিভাবে চলছে। এ বাবদ প্রতিবছর রাজস্ব বাজেটের আওতায় বরাদ্দের পরিমাণ প্রায় ৬ কোটি টাকা। অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধিতার বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ২০০৯ সাল হতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় এ যাবৎ অটিস্টিক শিশুসহ ৫০০ বিভিন্ন ক্যাটাগরির প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তাদের পিতা-মাতা/অভিভাবকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপ্লেক্স এবং জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র নির্মাণ

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণের লক্ষ্যে সরকার সাভার থানাধীন বারইগ্রাম ও দক্ষিণ রামচন্দ্রপুর মৌজার ১২.০১ একর খাস জমি প্রতীকী মূল্যে ২০১২ সালে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের নামে দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্ত প্রদান করেছে। তাছাড়া, এ সকল প্রতিবন্ধীর জন্য বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র নামে একটি কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে।

প্রতিবন্ধী উন্নয়ন অধিদফতর গঠন

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের প্রথম পৃষ্ঠপোষকমন্ডলীর সভায় ফাউন্ডেশনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ফাউন্ডেশনকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি পূর্ণাঙ্গ সরকারি অধিদফতরে রূপান্তর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০২ এপ্রিল ২০১৩ তারিখ ষষ্ঠ বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনকে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবন্ধী উন্নয়ন অধিদপ্তরে রূপান্তর করার সদয় ঘোষণা প্রদান করেছেন।

পরিবেশ ও বনায়ন কার্যক্রম

২০১১-২০১২ অর্থ বছরে জুন/১২ পর্যন্ত সমাজসেবা অধিদফতর জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ১,৭৩,১৭১ টি চারা বিতরণ করেছে এবং শুরু হতে এ পর্যন্ত ৩২,৬১,৯৪০ টি চারা বিতরণ করা হয়েছে।

উন্নয়ন প্রকল্প

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদফতরের আওতায় ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন মোট উন্নয়ন প্রকল্প ২০টি। এর মধ্যে ৩ টি বৈদেশিক সাহায্য পুষ্ট প্রকল্প রয়েছে। বৈদেশিক সাহায্য পুষ্ট প্রকল্পের মধ্যে ১টি উন্নয়ন প্রকল্প এবং ২টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। প্রকল্পগুলোর অনুকূলে চলতি অর্থ বছরে মোট ১৭৮ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

যুব ও ক্রীড়া

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ হচ্ছে যুবক। এ বিশাল যুবসম্প্রদায়কে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করার জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এ প্রেক্ষাপটে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ১৯৮১ সাল থেকে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ট্রেডে ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত ৩৯ লক্ষ ৪৫ হাজার ২৮৩ জন যুবক ও যুবমহিলাকে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়েছে। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ২,৭৮,৫৯৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ অধিদপ্তরের সৃষ্টিলগ্ন থেকে ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত মোট ৭ লক্ষ ৮৬ হাজার ৯৫৩ জন উপকারভোগীকে ঘূর্ণায়মান তহবিলসহ ১১২২ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা ঋণ দেয়া হয়েছে।

দেশের শিক্ষিত বেকার যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে ''ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি'' বাস্তবায়ন করছে। এ কর্মসূচির অনুমোদিত নীতিমালা অনুসারে উচ্চ মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন

যুবক/যুবমহিলাদের জাতিগঠনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে কুড়িগ্রাম, বরগুনা ও গোপালগঞ্জ জেলাকে কর্মসূচির পাইলটিং এলাকা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমানে রংপুর বিভাগের অবশিষ্ট ৭টি জেলার মোট ৮টি উপজেলায় এ কর্মসূচি সম্প্রসারিত হচ্ছে। এ কর্মসূচির শুরু থেকে ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত কুড়িগ্রাম, বরগুনা এবং গোপালগঞ্জ জেলায় মোট ৫৬,০৫৪ জনের অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে এ বাবদ ২২৫ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এ কর্মসূচি দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় সম্প্রসারণ করা হবে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারেও কাজ করছে। দেশের ৬৪টি জেলায় ৭০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষিত বেকার যুবকদের ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্কিং সহ কম্পিউটার বেসিক কোর্স ও গ্রাফিক ডিজাইন কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত মোট ১,১৩,৯৪২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, ভ্রাম্যমাণ আইসিটি ভ্যানের মাধ্যমে ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্কিং সহ কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, ক্লাবভিত্তিক যুব কর্মসূচি সারা দেশে সম্প্রসারণ ও জোরদার করার উদ্দেশ্যে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্মেলন, সমাবেশ, সেমিনার, কর্মশিবির, গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণের জন্য জাতীয় পর্যায়ে 'শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র' স্থাপন করা হয়েছে। জাতীয় যুব কেন্দ্র মূলতঃ একটি মানব সম্পদ উন্নয়ন, তথ্য ও গবেষণা কেন্দ্র। এ কেন্দ্রের মাধ্যমে এ পর্যন্ত মোট ১৩,২৮৩ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থ বছরে ও অনুন্নয়ন খাত হতে ৪৮টি যুব সংগঠনকে ৪.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্পভিত্তিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় ডিসেম্বর, ১২ পর্যন্ত মোট ১১২২ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ (ঘূর্ণায়মান ঋণের তহবিলসহ) করে ৯৭৮ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে।

সারণি ১২.৫: ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় বিতরণ ও আদায়কৃত অর্থের হিসাব

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সংস্থা	ক্রমপুঞ্জিত জুন, ২০০৯ পর্যন্ত	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩ (ডিসেম্বর/১২ পর্যন্ত)	ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর						
	বিতরণ	৮৬৪.১৮	৬১.০৪	৭০.০৩	৮৪.২৬	৪২.৬৬	১১২২.১৭
	আদায়	৭৫৫.৫৮	৫৫.১০	৬১.৫৯	৭০.০৫	৩৬.৩৬	৯৭৮.৬৮
	আদায়ের হার (%)	৮৭.৪৩	৯০.২৬	৮৭.৯৫	৮৩.১৩	৮৫.২৩	৮৭.২১

উৎসঃ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

ক্রীড়া পরিদপ্তর

বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচি (রাজস্ব)

দেশের তৃণমূল পর্যায়ে শিশু-কিশোর ও তরুণদের ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্রীড়া ক্লাব ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ক্রীড়া সচেতনতা সৃষ্টি, ক্রীড়া মানসিকতার উন্মেষ সাধন ও ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণের লক্ষ্যে "ক্রীড়া পরিদপ্তর" নানামূখি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ক্রীড়া পরিদপ্তর কর্তৃক বার্ষিক ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ভলিবল, হ্যান্ডবল, দাবা, সাঁতার, ব্যাডমিন্টন, অ্যাথলেটিক্স এবং গ্রামীণ খেলাধুলার মাধ্যমে ক্রীড়া উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির মাধ্যমে, দেশের জেলা সদর ও উপজেলা পর্যায়ে (প্রতি জেলায় ১টি করে) মোট ৪,৯২৮টি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে। ক্রীড়া পরিদপ্তর প্রণীত বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচি ২০১২-২০১৩ অনুযায়ী এ দেশের প্রতিটি জেলার ক্রীড়া কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী ছেলেমেয়েদের মধ্য হতে প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের তালিকা প্রস্তুত করা হবে। ক্রীড়া পরিদপ্তরের ক্রীড়া কর্মসূচির মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায় হতে ক্রীড়া প্রতিভা নিরূপণসহ প্রতি বছর প্রায় ১,৫০,০০০(এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) শিশু-কিশোরকে ক্রীড়াক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ

ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাধীন ৬টি সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ এর অধীনে স্নাতক ডিগ্রীধারী যুবক ও যুবমহিলাদের এক বছরের নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (বিপিএড) ডিগ্রী প্রদান করা হয়। ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে

(জানুয়ারি/১৩ থেকে ডিসেম্বর/১৩ পর্যন্ত এক বছর মেয়াদি) বিপিএড (Bachelor of Physical Education) কোর্সে ৩৮৫ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বিপিএড (Bachelor of Physical Education) ডিগ্রি প্রদানের নিমিত্ত আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ

জাতীয় উন্নয়নে খেলাধূলা জরুরি উপাদানসমূহের অন্যতম হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নেও খেলাধূলা যুগযুগ ধরে একটি বিশেষ বাহনের ভূমিকা পালন করে আসছে। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যেমন: বিশ্ব অলিম্পিক, এশিয়ান গেমস-এর মত ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আসরে বিভিন্ন দেশের ক্রীড়াবিদগণ নিজ নিজ দেশের জন্য সম্মান, সুনাম ও গৌরব বয়ে আনেন। খেলাধূলার উন্নয়নে ক্রীড়া অবকাঠামো অপরিহার্য। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৩টি প্রকল্পের অনুকূলে ১১০৮৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এ প্রকল্প গুলো হলো (১) গোপালগঞ্জ জেলা সুইমিংপুল ও জিমন্যাসিয়াম নির্মাণ, শেখ কামাল স্টেডিয়ামের উন্নয়ন, পুরাতন জেলা স্টেডিয়ামের সংস্কার এবং মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ ।

বিকেএসপি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৪ সালে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের অধীনে 'বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব স্পোর্টস (বিআইএস)' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করে, যার ফলশ্রুতিতে ১৯৭৬ সালে 'বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব স্পোর্টস (বিআইএস)' একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে ১৯৮৩ সালে সরকারের একটি স্বায়ত্তশাসিত ও বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)' হিসেবে নামকরণ করা হয়। ১৯৮৬ সালের ১৪ এপ্রিল থেকে এ প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়।

সাংস্কৃতিক উন্নয়ন

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, সংরক্ষণ, প্রসার ও সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর অধীনস্থ ১৭টি দপ্তর/সংস্থা বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে এবং এর মাধ্যমে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা, নাটক, চলচ্চিত্র এবং সৃজনশীল প্রকাশনাসহ সুকুমার শিল্পের সকল শাখার উৎকর্ষ সাধনে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, চারুকলা, নাট্যকলা, সংগীত ইত্যাদির মাধ্যমে জাতীয় সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, সংরক্ষণ, প্রসার ও উৎসাহ প্রদানের কাজ করছে। বাংলা একাডেমী, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র শিক্ষা, গবেষণা,পুস্তক, জার্নাল প্রকাশসহ সকল শ্রেণীর পাঠকের পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করছে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করছে। আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর শিক্ষা, গবেষণা কাজে পুস্তক, জার্নাল নথিপত্র সংরক্ষণ ও প্রকাশ করছে । কপিরাইট অফিস দেশিয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সৃজনশীল ব্যক্তিবর্গের মেধাস্বত্ত্ব সংরক্ষণসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাইরেসি রোধ করছে। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর দেশের পুরাকীর্তি সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করছে। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন লোকজ ও কারুশিল্প উন্নয়নের জন্য নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ৭টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ঐতিহ্য বিকাশ ও সংরক্ষণের কাজ চলছে। এছাড়া জেলা পাবলিক লাইব্রেরীর উন্নয়ন, জাতীয় চিত্রশালা নির্মাণ, হাছনরাজা একাডেমি নির্মাণ, পল্লীকবি জসিম উদ্দিন সংগ্রহশালা নির্মাণ, লালবাগ কেল্লা সাউন্ড এন্ড লাইট শো ও অন্যান্য সংস্কার কার্যক্রমসহ বাংলা একাডেমী ভবন নির্মানের কাজ শেষ পর্যায় রয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার আধুনিকীকরণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৯.৩১ কোটি টাকা ব্যয়ে জাতীয় গ্রন্থাগারে ডিজিটাল তথ্য সংরক্ষণাগার তৈরি, অনলাইনে তথ্য আদান-প্রদান, স্বয়ংক্রিয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা, ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে গবেষক ও শিক্ষার্থীদের শিক্ষা পদ্ধতি চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অপ্রচলিত মূল্যবান নথিসমূহের সংগ্রহ ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় পঁচিশ বছরের উর্ধ্বে দলিল-দস্তাবেজ ও নথি সংগ্রহ করা, জাতীয় আর্কাইভে মূল্যবান নথিসমূহ বৈজ্ঞানিক উপায়ে দীর্ঘ সময়ের জন্য সংরক্ষন এবং ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ক্যাটালগ ইন্টারনেটে প্রচার করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

অর্থ বরাদ্দ

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ৯টি অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য মোট ৩০.৫২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এছাড়া, দেশজ সংস্কৃতির বিকাশের লক্ষ্যে ২০১১-১২ অর্থ বছরে ২২টি কর্মসূচির অনুকূলে রাজস্ব বাজেট হতে মোট ২৬.৮ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান

দেশে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম একটি দ্রুত বিকাশশীল অর্থনীতির ভিত্তি রচনার লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এলক্ষ্যে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক বজায় রেখে উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, দেশের অদক্ষ জনগোষ্ঠীকে স্বল্প, মধ্যম ও দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, দেশের শ্রম সেক্টরে সুষ্ঠু শ্রম ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা, শিল্প ও কারখানাসমূহে সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা, বিভিন্ন শিল্প এলাকায় শ্রম-কল্যাণমূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা, শ্রম সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ বাস্তবায়ন, শ্রম আদালতের মাধ্যমে শ্রম ক্ষেত্রে সুবিচার নিশ্চিত এবং শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ করার লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রতিনিয়ত কাজ করে আসছে। এছাড়া, শ্রমজীবী মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, যুব সমাজে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জাতীয় শ্রমনীতি পূনঃমূল্যায়ন ও সংশোধন, ন্যূনতম মজুরি পুনঃনির্ধারণ, শিশু শ্রম নিরসন বিষয়েও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের বিপুল সংখ্যক বেকার জনগোষ্ঠীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানবসম্পদে পরিণত করার জন্য দেশের ২৬টি জেলায় ৩২৫.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪টি প্রকল্পের মাধ্যমে ২৬টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (মহিলাদের জন্য ৬টি সহ) স্থাপন করা হয়েছে। এ সকল কেন্দ্রে ১৯টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে এবং প্রতি বছর প্রায় ২০ হাজার প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের উপযোগী করে গড়ে তোলা হচ্ছে। উল্লেখ্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে দেশে মানব সম্পদের দক্ষতার উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে 'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১' অনুমোদিত হয়েছে।

অর্থ বরাদ্দ

২০১২-১৩ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত এ মন্ত্রণালয়ের ৬টি প্রকল্পের অনুকূলে সর্বমোট ৯৯.১০ কোটি (প্রকল্প সাহায্যঃ ২৩.৪০ কোটি টাকা এবং স্থানীয় মুদ্রাঃ ৭৫.৭০ কোটি) টাকা বরাদ্দ রয়েছে।